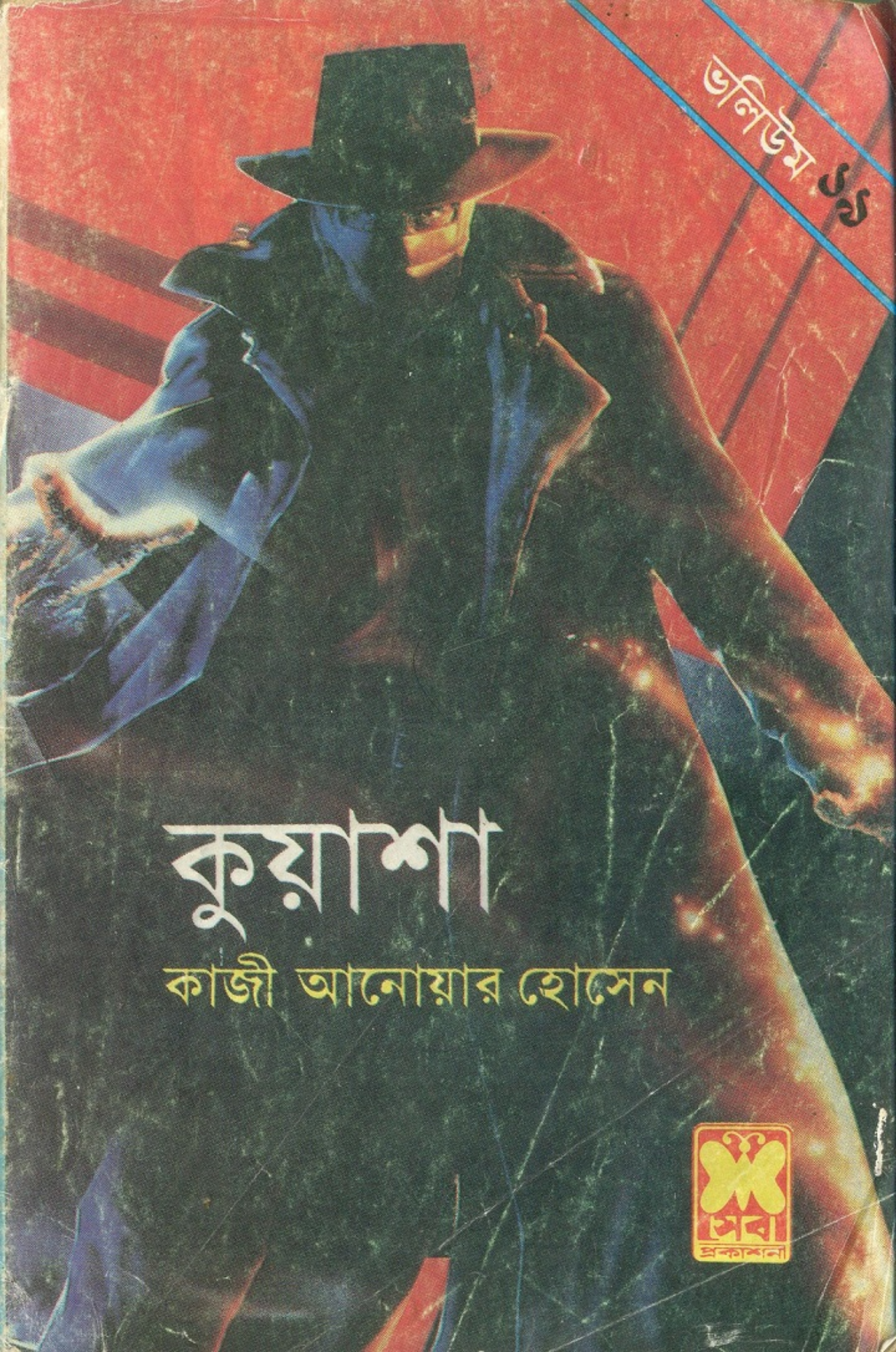
ভলিউম ৫৫
কুয়াশা
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম- ১৯

কুয়াশা
৫৫. ৫৬. ৫৭

কাজী আনোয়ার হোসেন

কুয়াশা, শহীদ ও কামাল।
দেশে-বিদেশে অন্যায় অবিচারকে দমন করে
সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করাই এদের জীবনের ব্রত।
এদের সঙ্গে পাঠকও অজানার পথে
দুঃসাহসিক অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারবেন,
উপভোগ করতে পারবেন
রহস্য, রোমাঞ্চ ও বিপদের স্বাদ।
শুধু ছোটরাই নয়, ছোট-বড় সবাই এবই পড়ে
প্রচুর আনন্দ লাভ করবেন।
আজই সংগ্রহ করুন।

mmhs013

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী
সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ISBN 984-16-1109- 0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 19
KUASHA SERIES: 55, 56, 57
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

চব্বিশ টাকা

কুয়াশা ৫৫ ৫—৪২
কুয়াশা ৫৬ ৪৩—৮৪
কুয়াশা ৫৭ ৮৫—১২৮

mmhs013

কুয়াশা ৫৫

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৭৬

এক

সকাল হতেই চমকপ্রদ সেই খবর বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ল শহরময়। ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল মানুষ। রাস্তার মোড়ে মোড়ে, হোটেলের সামনে, হাটে-মাঠে-ঘাটে-বন্দরে মানুষের ভিড় জমে উঠল। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন—কোথায় কুয়াশা? কোথায়?

ঘর্মাক্ত কলেবরে সাংবাদিকরা চরকির মত ঘুরছে। চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী, ছাত্র, বেকার যুবক—গোটা শহরের প্রায় সব মানুষ মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিল কুয়াশার সন্ধান পাবার জন্য।

কিন্তু কোথায় কুয়াশা?

বেলা ক্রমশ বাড়তে লাগল। উত্তেজনা চরমে উঠল। ছটফট করছে মানুষ। সবাই চাইছে সবার আগে কুয়াশার দেখা পেতে। কিন্তু চাওয়াটাই সার, কুয়াশার ছায়াও কেউ আবিষ্কার করতে পারছে না।

পুলিস বিভাগও বসে নেই। বড় কর্তারা হুকুম জারি করছেন—কুয়াশাকে দেখামাত্র রিপোর্ট করো। পুলিস বিভাগের ঊর্ধ্বতন অধঃস্তন কর্মচারীরা ব্যক্তিগত স্বার্থেই শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। দশ লক্ষ টাকার ব্যাপার—ছেলে খেলা কথা নয়। যে কুয়াশার সন্ধান দিতে পারবে সে-ই পাবে দশ লক্ষ টাকা। প্রতিটি মানুষ চেষ্টা করছে সুযোগটা গ্রহণ করার। কার ভাগ্যে কি আছে, কেউ তা বলতে পারে না। একজন ভিখারী হয়তো দেখা পেয়ে যাবে কুয়াশার। একবার দেখা পেলেই হলো, দশ লক্ষ টাকার মালিক বনে যাবে সে এক মুহূর্তে!

কেউ জানে না কার ভাগ্যে আছে পুরস্কারের এই দশ লক্ষ টাকা।

চেষ্টা করছে সবাই। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ খবর নেয়া হচ্ছে। হাজার হাজার টেলিফোন কল বুক করা হচ্ছে। খবর আসছে ঢাকা থেকে, খুলনা থেকে, দিনাজপুর থেকে, রাজশাহী থেকে। সব খবরই নেতিবাচক। কোথাও নেই কুয়াশা। কেউ তার সন্ধান পাচ্ছে না। এমন বিশাল চেহারার মানুষটা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

দুপুর নাগাদ জেগে উঠল গোটা দেশ। রেডিও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রচার করা হলো পুরস্কারের ঘোষণাটা।

ঘোষণায় বলা হলো:

> চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে অগ্রসরমান সমুদ্রগামী জাহাজ বিউটি কুইনের ওয়্যারলেস থেকে একটি মেসেজ পাঠানো হয়েছে দেশের সংবাদপত্রে ছাপার জন্য এবং রেডিও স্টেশন থেকে প্রচার করার জন্য।

মেসেজে মি. কুয়াশার সন্ধান চাওয়া হয়েছে। মি. কুয়াশার সন্ধান পাওয়ামাত্র তাঁকে জানাতে হবে তিনি যেন অনতিবিলম্বে বিউটি কুইনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁকে জানাতে হবে, এই ব্যাপারের সঙ্গে শতাধিক লোকের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মি. কুয়াশার সন্ধান পাবেন এবং তাঁকে এই মেসেজের বক্তব্য জানাতে পারবেন তিনি পুরস্কার স্বরূপ দশ লক্ষ টাকা পাবেন। ঘোষণা প্রচারকারীর নামের জায়গায় লেখা আছে—বিপদ গ্রস্ত!

বিকেল বেলা দেশের বড় বড় শহর থেকে দৈনিক সংবাদপত্রগুলো টেলিগ্রাম বের করল। বড় বড় হেডিং দিয়ে ছাপা হলো:

কুয়াশার সন্ধান পাওয়া যায় নাই!

দ্রুত বয়ে যাচ্ছে সময়। বুকে আশা নিয়ে মানুষ অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু চেষ্টা করাই বুঝি সার। কেউ জানে না, কেউ বলতে পারছে না কোথায় আছে কুয়াশা।

সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে ভিড় জমে উঠল চট্টগ্রাম পোর্টে। দলে দলে মানুষ ছুটে চলেছে বন্দরের দিকে। নিরাপত্তা বাহিনীর প্রহরীরা মানুষের স্রোতকে বাধা দিয়ে আটকাতে পারল না। সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার না থাকলেও সেদিন সন্ধ্যায় কেউ মানল না বন্দরের আইন কানুন, সবাই সাগরের তীরের দিকে ছুটল।

কয়েক শত ট্রাফিক পুলিস হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে যানবাহনের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে। অফিসাররা গলদঘর্ম হয়ে পড়ছেন নির্দেশ দিতে দিতে।

সাগরের তীরে জেটির উপর হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, সবাই অপেক্ষা করছে বিউটি কুইনের জন্য।

বিউটি কুইন জাহাজ থেকেই পুরস্কারের ঘোষণা প্রচার করা হয়েছে। কৌতূহলী মানুষ জানতে চায় কে সেই মানুষ যে কুয়াশার সন্ধান পাবার জন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছে। দশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কেন সে কুয়াশার দেখা পেতে চায়? কি এমন বিপদে পড়েছে সে?

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। পার্কিং এলাকা থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে একটা উজ্জ্বল নীল রঙের ঝকঝকে মার্সিডিজ গাড়ি মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে থামল। হাতের স্টিক উঁচিয়ে তেড়ে এল একজন সেপাই।

'কী আশ্চর্য! আপনারা পেয়েছেন কি! গাড়ি পার্ক করার জায়গা পেলেন না আর···।'

সেপাই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। মুখের ভাব বদলে গেল তার। নিখুঁত ভঙ্গিতে স্যালুট করে অপ্রতিভ হাসল সে। ড্রাইভারের সীটে বসে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে সবিনয়ে উচ্চারণ করল, 'দুঃখিত, স্যার। আপনাকে আমি চিনতে পারিনি।'

মার্সিডিজের ড্রাইভার প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ শহীদ খান। শহীদের পিছনে আর একজন আরোহী রয়েছে। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন লোকটা তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। একটু যেন অন্যমনস্ক বা চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

একটু ঝুঁকে পড়ে গাড়ির দ্বিতীয় আরোহীর দিকে তাকাল সেপাই। ভদ্রলোক

সম্ভবত ইউরোপিয়ান, অনুমান করল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে চশমা, ধূসর রঙের একটা ট্রপিক্যাল স্যুট পরনে।

শহীদের দিকে চোখ ফেরাল সেপাই। বলল, 'মি. কুয়াশার সন্ধান পেয়েছেন নাকি, স্যার? দশ লক্ষ টাকার ব্যাপার···।'

মুচকি হাসল শহীদ। বলল, 'পুরস্কারের ঘোষণাটা ঢাকায় পৌঁছয় সকাল দশটায়। সম্ভাব্য সব জায়গায় সন্ধান চালিয়েও ব্যর্থ হই। ঘণ্টা দু'য়েক পর বাড়ি ফিরে দেখি সে আমার বাড়িতে বসে আছে। বুঝতেই পারছেন কুয়াশাকে আবিষ্কার করার কৃতিত্ব আমার নয়—সে স্বইচ্ছায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তারমানে, দশ লক্ষ টাকা দাবি করতে পারছি না আমি। তা যাই হোক, এদিকের খবর কতটুকু কি জানেন আপনি? রেডিওর ঘোষণা শুনেছি আমি, তার বেশি কিছু জানি না এখনও।'

সেপাই বলল, 'সবাই এইটুকুই জানে এখন পর্যন্ত, স্যার। দুঃখিত, আপনাকে নতুন কোন তথ্য জানাতে পারলাম না। তা মি. কুয়াশা কি আপনার সঙ্গেই চট্টগ্রামে এসেছেন, স্যার?'

সেপাই আবার তাকাল শহীদের পাশে বসা সুদর্শন, দীর্ঘদেহী আরোহীর দিকে।

শহীদ বলল, 'না। ঢাকাতেই রয়ে গেছে সে।'

স্যালুট করে ফিরে গেল সেপাই নিজ কর্তব্যে।

মার্সিডিজের ভিতর থেকে ভেসে এল ভরাট গলার মৃদু হাসি। দ্বিতীয় আরোহী গাড়ি থেকে নামল। তার হাতে একটা ব্রীফকেস দেখা যাচ্ছে। বলল, 'শহীদ, এখানেই অপেক্ষা করো তুমি।'

শহীদ বলল, 'ঠিক আছে।'

বলাই বাহুল্য, ইউরোপিয়ান চেহারার গাড়ির দ্বিতীয় আরোহী ছদ্মবেশধারী স্বয়ং কুয়াশা ছাড়া আর কেউ নয়।

যানবাহন এবং সহস্রাধিক লোকজনের ভিড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা।

হকাররা ছুটোছুটি করছে টেলিগ্রাম নিয়ে। তাদের চিৎকারে কানপাতা দায়। গাড়ির ভিতরে বসে একজন হকারকে হাতছানি দিয়ে ডাকল শহীদ। দশ পয়সা দিয়ে একটা টেলিগ্রাম কিনল।

কুয়াশার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি এই খবরটা বড় বড় হেডিংয়ে ছাপা হয়েছে। তার পাশে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণাটা ছাপা হয়েছে। কিন্তু শহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল অন্য একটি খবর।

খবরটা বেশ বড় বড় অক্ষরেই ছাপা হয়েছে।

খুলনার আকাশে ভৌতিক আকাশযান!

হেডিংয়ের নিচে খবরটা এই রকম:

নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত।

গত কয়েক দিন যাবৎ খুলনার আকাশে অদ্ভুত আকৃতির একটি আকাশযান দেখা যাইতেছে। গত পরশু বেলা দুইটার সময় কয়েক মিনিটের জন্য ইহাকে দেখা যায়। গতকালও কেউ কেউ নাকি ইহাকে দেখিতে পাইয়াছেন। আকাশের অনেক উপর দিয়া উড়িয়া যায় বলিয়া

ইহাকে খালি চোখে পরিষ্কার দেখা যায় না। আকাশযানটি দেখিতে লম্বা আকৃতির, অনেকটা চুরুটের মত। খুলনা শহরে এই রহস্যজনক আকাশযানটিকে কেন্দ্র করিয়া নানারকম অলৌকিক গুজব ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

খবরটা পড়ে চিন্তিত হলো শহীদ। চুরুটের মত দেখতে জিনিসটা। মনে পড়ে গেল কাউন্ট জেপলিনের কথা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাউন্ট জেপলিন আশ্চর্য ধরনের একটা আকাশযান আবিষ্কার করেন। সেটা দেখতে ছিল প্রকাণ্ড আকারের একটা চুরুটের মত। তাঁর সেই আকাশযানের নাম রাখা হয়েছিল জেপলিন।

কিন্তু সেই যুগ গত হয়েছে। এই রকেটের যুগে জেপলিন আসবে কোত্থেকে? হঠাৎ শহীদের মনে একটা প্রশ্ন জাগল। দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের সঙ্গে কি এই ভৌতিক আকাশযানের কোন সম্পর্ক আছে?

সন্দেহটা শুধু শহীদের মনে নয়, আরও বহু লোকের মনেই উদয় হলো।

সাংবাদিকরাও তুমুল তর্কে মেতে উঠেছে জেটির ওপর দাঁড়িয়ে। দৈনিক প্রভাতের বয়স্ক সাংবাদিক তার সহকারীর উদ্দেশ্যে বলছিলেন, 'ভৌতিক আকাশযানের সঙ্গে এই দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণার কোন যোগাযোগ থাকা বিচিত্র কিছু নয়, যাই বলো।'

তরুণ সাংবাদিক আনিস বলল, 'দূর! দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ব্যাপারটা স্রেফ পাবলিসিটি স্টান্ট! আমার বিশ্বাস, কুয়াশা তার নিজের জনপ্রিয়তা বাড়াবার জন্যে চালাকি করে নিজেই ঘোষণা করেছে।'

'কি! তুমি দেখছি এক নম্বরের একটা গাধা! যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।'

আনিস দমল না। বলল, 'আপনি যাই বলুন, আমার ধারণা, এমন কোন পাগল পৃথিবীতে থাকতে পারে না যে শুধু কুয়াশার সন্ধান পাবার জন্য দশ লক্ষ টাকা দিতে পারে।'

প্রবীণ সাংবাদিক এনায়েত খেপে গিয়ে বললেন, 'ছেলে মানুষ আর বলে কাকে! কখনও সামনাসামনি দেখেছ কুয়াশাকে? তার সাক্ষাৎকার নেবার ভাগ্য হয়েছে কখনও তোমার? তাকে নিয়ে কাজী আনোয়ার হোসেনের লেখা কুয়াশা সিরিজের বইগুলো পড়েছ?'

'না···।'

'তাহলে কথা না বলে চুপ করে থাকো। তার সম্পর্কে আমি বলছি, মন দিয়ে শুনে যাও শুধু। কুয়াশা একজন বিজ্ঞানী। পৃথিবীতে জীবিত যত বিজ্ঞানী আছেন তাঁদের মধ্যে তাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করা হয়। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখাতে সে আর সবার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। শুধু তাই নয়, তার শরীর সম্পর্কে আরও বিস্ময়কর তথ্য তোমাকে শোনাতে পারি। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে লাফ দিয়ে কতটুকু উপরে উঠতে পারে সে তা জানো? এগারো ফুট! বিশ্বাস হয়? যে কোন মোটর গাড়িকে সে দুই হাত দিয়ে শূন্যে তুলে ফেলতে পারে। ছুটন্ত সাত টন ওজনের ট্রাককে সে পিছন থেকে ধরে থামিয়ে দিতে পারে। তার একটা ঘুসির ওজন সাড়ে পাঁচ মণ। বিরতি না নিয়ে ৪৮ ঘণ্টা দৌড়ুতে পারে সে। আরও শুনবে?

পৃথিবীর সব প্রচলিত ভাষা জানা আছে তার। পৃথিবীর একমাত্র লোক সে—যে এই পৃথিবী ত্যাগ করে অন্য এক গ্রহে গিয়েছিল। জানো তুমি, কুয়াশা সূর্যের ভিতর দিয়ে টুইন আর্থে গিয়েছিল। যে কোন লোককে সে হিপনোটাইজ করতে পারে। লিপ রিডিং জানে সে। থট রিডিংয়ে তাকে জিনিয়াস্ বলা হয়। আরও শোনো। পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অ্যাডভেঞ্চারার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে সে। ভয়-ডর বলে কিছু জানা নেই কুয়াশার। ন্যায়ের জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া তার ধর্ম। সে মানবতাবাদী। আরও শুনবে? কত বলব। তার সম্পর্কে সব বলতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে···।'

তরুণ সাংবাদিক আনিস গম্ভীর হয়ে উঠল। প্রবীণ সাংবাদিকের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি সে। শেষ পর্যন্ত সে বলল, 'জানি না। একজন মানুষ একাধারে এতগুলো গুণের অধিকারী হতে পারে না। অসম্ভব!'

'কে বলল পারে না? চেষ্টা করলে সবাই পারে। এই সব গুণ অর্জন করার জন্য কুয়াশা সাধনা করেছে, চর্চা করেছে, অনেক কিছু ত্যাগ করেছে। তুমিও সাধনা করো, তুমিও পারবে।'

আনিস অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এমন সময় সাগরের দিকে আলো ফেলল একটা সার্চ লাইট। তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে দেখা গেল একটি মাঝারি আকারের জাহাজকে। উপস্থিত হাজার হাজার দর্শক শোরগোল করে উঠল।

জাহাজটার গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে, 'বিউটি কুইন'।

আনিস প্রশ্ন করল, 'জেটিতে ভিড়ছে না কেন জাহাজটা?'

প্রবীণ সাংবাদিক বললেন, 'কারণটা অজ্ঞাত। জাহাজের ক্যাপ্টেন চায় না কেউ জাহাজে উঠুক। এ ব্যাপারে ওয়্যারলেসে আগেই সাবধান করে দেয়া হয়েছে। কোন লোককে বিউটি কুইনে ওঠার অনুমতি দেয়া হবে না।'

'তাহলে···।'

'স্স্স্—চুপ! আমি একটা বুদ্ধি করে রেখেছি। খবর যেভাবে হোক সংগ্রহ করতেই হবে। একটা মটরবোট ভাড়া নিয়ে রেখেছি। জাহাজের পেছন দিকে চলে যাব, চেষ্টা করব উপরে উঠতে···।'

'চমৎকার। তবে আর দেরি কেন!'

দুই সাংবাদিক দ্রুত পা বাড়াল।

দুই

জেটিগুলোর কাছ থেকে অনেক দূরে অন্ধকার একটা খাদের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে কুয়াশা। তার পরনে সুইমিং কস্টিউম। ব্রিফকেস থেকে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করে তার ভিতর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে নিল সে। ব্রীফকেসটা একটা পাথরের আড়ালে রেখে প্লাস্টিকের ব্যাগটা জিপ এঁটে হুক দিয়ে আটকে নিল কোমরের সঙ্গে, তারপর পানিতে নামল।

দ্রুত সাঁতার কেটে এগুচ্ছে কুয়াশা। এদিকটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষজনের শোরগোলের শব্দ। বহুদূরে সাগরের উপর ভাসছে বিউটি কুইন। কুয়াশা সেদিকেই সাঁতার কেটে এগুচ্ছে।

বিউটি কুইনকে বহুদূর থেকে পাশ কাটিয়ে আরও সামনে এগিয়ে গেল কুয়াশা। প্রায় পঞ্চাশ গজ এগিয়ে থামল সে। পিছন ফিরে তাকাল। তারপর বাঁক নিয়ে আবার সাঁতার কাটতে লাগল।

দ্রুত বিউটি কুইনের পিছন দিকে পৌঁছুল কুয়াশা। মাইল দেড়েক সাঁতার কেটেও এতটুকু ক্লান্ত হয়নি সে। নিঃশ্বাস পড়ছে, কিন্তু কোন শব্দ হচ্ছে না।

উপর দিকে তাকিয়ে জাহাজের রেলিং দেখতে পেল কুয়াশা। পানির উপর প্লাস্টিকের ব্যাগটা তুলে খুলল সেটা। বের করে আনল এক প্রস্থ নাইলনের কর্ড। কর্ডের এক প্রান্তে একটা হুক দেখা গেল। হুক সহ কর্ডটা সে ছুঁড়ে দিল উপর দিকে। এদিকে কোন মই বা সিঁড়ি নেই, কর্ড ধরে ঝুলতে ঝুলতেই উঠতে হবে।

রেলিংয়ের সঙ্গে আটকে গেল হুকটা। কর্ড ধরে উপরে উঠতে শুরু করল সে।

কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল কুয়াশা রেলিং টপকে অন্ধকার ডেকের উপর নামছে। ডেকে নেমে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে একটা ড্রামের পিছনে আত্মগোপন করল সে।

আবার প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলল কুয়াশা। তোয়ালে বের করে গা মুছল। ভিজে পায়ে ডেকে হাঁটাহাঁটি করলে তার উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়বে—তা সে চায় না।

চাঁদহীন, তারাহীন আকাশ। ডেকেও কোন আলো নেই। অন্ধকারে পা ফেলে ড্রামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা। দীর্ঘদেহী একটা ছায়ামূর্তি, দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

ডেক থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশা।

পরমুহূর্তে ডেকের বিপরীত প্রান্ত থেকে অপর একটি ছায়ামূর্তিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ছায়ামূর্তিটি বেশ লম্বা কিন্তু তার শরীরে মাংস বলতে কিছু নেই যেন! প্রায় কঙ্কালই বলা যায় লোকটাকে। লোকটার হাতে বড় আকারের একটা কালো রিভলভার। শক্ত হাতে ধরে আছে সেটাকে। অস্থির, ভীত বলে মনে হচ্ছে তাকে। প্রতি মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাচ্ছে সে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াচ্ছে, দম বন্ধ করে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। অকারণেই চমকে উঠে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ঘনঘন।

ডেক পেরিয়ে একটা প্যাসেজে ঢুকল সে। দাঁড়াল একটা দরজার সামনে। এদিক-ওদিক তাকাল দ্রুত। তারপর দরজার গায়ে টোকা মারল—প্রথমে ঠক করে একবার, তারপর ঠক ঠক ঠক করে তিনবার, তারপর ঠক ঠক করে দু'বার।

বোঝা যায়, এটা একটা সঙ্কেত।

বন্ধ দরজার ভিতর থেকে একটা ভাঙা গলা ভেসে এল। কণ্ঠস্বরটা চাপা এবং সন্দিগ্ধ।

'কে দরজায়?'

রিভলভারধারী লোকটা প্যাসেজের এদিক-ওদিক দেখে নিতে নিতে দ্রুত কিন্তু

ফিসফিসে গলায় বলল, 'আমি! আমি ইয়াকুব!'

দরজা খুলে গেল। দেখা গেল দরজার ভিতর যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তার হাতেও একটা উদ্যত রিভলভার রয়েছে।

ইয়াকুব দ্রুত কামরার ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দরজার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে। হাঁপাচ্ছে ঘনঘন। লোকটা যে শারীরিক ভাবে অস্বাভাবিক দুর্বল তা দেখেই বোঝা যায়।

দ্বিতীয় লোকটাও প্রথম লোকটার মত লম্বা, কিন্তু সে-ও অস্বাভাবিক রোগা। গাল ভেঙে গেছে দু'জনেরই। চোখগুলো ঢুকে গেছে ভিতরে। ঝুলে পড়েছে বাহুর চামড়া। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাকালে এখনও বোঝা যায় যে এরা এককালে স্বাস্থ্যবান এবং সুদর্শন ছিল। কিন্তু দু'জনেরই চেহারা হয়েছে কবর থেকে উঠে আশা কঙ্কালের মত। ত্রিশের কাছাকাছি বয়স ওদের, কিন্তু দেখে মনে হয় পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কবে।' 'মালেক, খারাপ খবর আছে!'

চাপা স্বরে বলল ইয়াকুব, 'দরজার ফাঁক দিয়ে এই একটু আগে দেখলাম একজন লোক ডেকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। লোকটাকে দেখে···।'

কেঁপে উঠল ইয়াকুবের সর্বশরীর থরথর করে।

বড় বড় আতঙ্ক ভরা চোখে মালেক চেয়ে আছে ইয়াকুবের দিকে। প্রায় শোনা যায় না, এমনি নিচু গলায় সে জানতে চাইল, 'কে? হাদি হুসেন, না উত্তাল?'

'চিনতে পারিনি। ওদের কেউই হবে মনে হয়···। মালেক, আমার ভয় করছে বড্ড। এভাবে একা একা থাকতে পারব না আমি। তিনজন একসঙ্গে থাকলে তবু বুকে সাহস পাব···।'

মালেক ঢোক গিলল। বন্ধ জানালা দরজাগুলোর দিকে তাকাল সে। বলল, 'শায়লার কাছে যাব বলছ? কিন্তু এখান থেকে বেরুনো কি উচিত হবে?'

ইয়াকুব নিরাশ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মালেকের দিকে। খানিক পর ইয়াকুব বলল, 'দু'জনে একসঙ্গে যাই, চলো। শায়লাকে খরবটা জানানো দরকার।'

সাবধানে দরজা খুলল ওরা। উঁকি মেরে দেখে নিল প্যাসেজটা। কেউ নেই। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল দু'জনেই অনেকক্ষণ ধরে।

'সেই শব্দটা—পাচ্ছ?'

ইয়াকুব বলল, 'না।'

'তবে চলো।'

প্যাসেজে বেরিয়ে এল দু'জন। দরজার তালা লাগিয়ে এলোমেলো পা ফেলে প্রায় ছুটতে শুরু করল ওরা। প্যাসেজের শেষ মাথায় গিয়ে থামল ওরা। এইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতেই হাঁপিয়ে গেছে। সামনের দরজায় টোকা মারল ইয়াকুব। প্রথমে একবার তারপর ঘনঘন তিনবার তারপর বিরতি নিয়ে আবার দু'বার।

দরজার কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক হলো। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা রিভলভারের নল।

মিষ্টি একটা নারী কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে···ওহ্, তোমরা!'

দরজাটা খুলে গেল। ইয়াকুব এবং মালেক প্রায় ধাক্কাধাক্কি করে ঢুকল কামরার ভিতর। শায়লা পারভিন বন্ধ করে দিল দরজা।

শায়লা পারভিন দেখতে অসাধারণ সুন্দরী। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স হবে তার। প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, সুগঠিত শরীর। রীতিমত ব্যায়াম করে নিজের স্বাস্থ্যটাকে এমন সুগঠিত করেছে তা দেখলেই বোঝা যায়।

'ভয় পেয়েছ মনে হচ্ছে?'

দু'জনকে ভাল করে দেখে নিয়ে প্রশ্ন করল শায়লা পারভিন।

'মিস শায়লা! হাদি হুসেন অথবা উত্তাল···ডেকের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে খানিক আগে···নিশ্চয়ই ওদের কেউ একজন হবে···।'

দ্রুত বদলে গেল শায়লা পারভিনের মুখের চেহারা। কি যেন ভেবে শিউরে উঠল সে। ভয়ে ভয়ে তাকাল বন্ধ-জানালা দরজাগুলোর দিকে।

'বলো কি? স্পষ্ট দেখেছ তুমি?'

'না। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখব কিভাবে! তবে মনে হলো লোকটা লুকিয়ে উঠেছে জাহাজে···।'

'লুকিয়ে উঠেছে? তাহলে ওদের মধ্যে কেউ একজন, সন্দেহ নেই।'

মালেক ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কিন্তু ওরা জানবে কিভাবে আমরা বিউটি কুইনে আছি?'

শায়লা পারভিন বলল, 'খুব সহজেই জানতে পেরেছে। আমরা যে সময় ওদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে পালিয়ে আসি সেই সময় আফ্রিকা থেকে একটিমাত্র জাহাজ বন্দর ত্যাগ করেছে—সুতরাং আমরা যে এই জাহাজে আছি তা অনুমান করে নিতে অসুবিধে হয়নি ওদের। আসার পথে মাঝে মাঝে আকাশ থেকে প্রপেলারের যে মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ভেসে আসতে শুনেছিলাম, তখনই সন্দেহ হয়েছিল আমার। ওরা আমাদের জাহাজটাকে খুঁজছিল। ভাগ্য ভাল যে সর্বক্ষণ আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, আবহাওয়া ছিল খারাপ। তা না হলে ওরা জাহাজটাকে ঠিকই দেখতে পেত। আর দেখতে পেলে—বোমা ফেলে চুরমার করে দিত নির্ঘাৎ।'

মালেক বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। আমার ধারণা ওরা জেপলিন নিয়ে এসেছে। জেপলিন নিয়ে এসেছে বলেই আমাদের আগে পৌঁছে গেছে ওরা···।'

'কি হবে এখন তাহলে। নরক থেকে ফিরে এসেও কি বাঁচার আশা নেই?'

শায়লা পারভিন বলল, 'ওরা চেষ্টা করবে আমাদেরকে যেমন করে পারে খুন করতে। সুতরাং, খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের। আমরা বেঁচে থাকলে ওদের অপরাধের কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়বে—এই ভয়ে ওরা মরিয়া হয়ে ছুটে এসেছে আফ্রিকার সেই দুর্গম নরক থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে···।'

ইয়াকুব হঠাৎ উন্মাদের মত আচরণ শুরু করল। নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরে সজোরে টানতে শুরু করল সে, 'আর সহ্য হয় না! ভয়ে ভয়ে এভাবে মানুষ বাঁচতে পারে না! মিস শায়লা, বিদায় দিন আমাকে। আমি আত্মহত্যা করব···।'

কথাটা বলে পকেট থেকে দ্রুত রিভলভারটা বের করে ফেলল ইয়াকুব। নিজের কপালের পাশে ঠেকাল সে রিভলভারের নল। কেঁদে ফেলল হাউ হাউ করে।

ছোঁ মেরে ইয়াকুবের হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিল শায়লা পারভিন। চোখ দুটো জ্বলে উঠল যেন তার। ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন আগুন।

'ইয়াকুব! তুমি এত বড় স্বার্থপর তা আমার জানা ছিল না। আত্মহত্যা করবে? বুঝেছি, আত্মহত্যা করে নিজেকে বাঁচাতে চাও তুমি। ইয়াকুব, তুমি একটা কাপুরুষ। আশ্চর্য! নিজের কথাটাই ভাবছ শুধু—ভুলে গেছ ইতিমধ্যে দুর্ভাগা সেই দেড়শো লোকের কথা? দেড়শো মানুষ—ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে যাদেরকে! ভুলে গেছ প্রতিজ্ঞার কথা? তুমিই না বলেছিলে যে ওদেরকে যতদিন না মুক্ত করতে পারবে ততদিন পেট ভরে খাবে না, মন খুলে হাসবে না?'

নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল ইয়াকুব।

শায়লা পারভিন তার একটা হাত ধরল। নরম, শান্ত হয়ে উঠল এবার তার কণ্ঠস্বর, 'নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করো, ইয়াকুব। সংগ্রাম করে এতদূর পালিয়ে এসেছি আমরা। পিছু পিছু ওরা এসেছে ঠিক, কিন্তু এখানে ওদের শক্তি খুব বেশি নয়। জানি, ওরা আমাদেরকে হত্যা করার জন্যে সবরকম চেষ্টা করবে। কিন্তু তাতে ভয় পেলে চলবে কেন। বেঁচে থাকতে হবে আমাদেরকে, ইয়াকুব। নিজেদের জন্যে নয়, বেঁচে থাকতে হবে অভাগা সেই দেড়শো ক্রীতদাসের জন্য। ওদেরকে মুক্ত করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে।'

ভিজে চোখ তুলে ইয়াকুব তাকাল শায়লা পারভিনের দিকে। বলল, 'মাফ করুন, মিস শায়লা। আমি ওদের কথা ভুলে গিয়েছিলাম।'

মালেক বলল, 'আচ্ছা, দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলো অথচ এখনও কুয়াশার তরফ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ব্যাপারটা কি হতে পারে? এমনও হতে পারে, কুয়াশা হয়তো আমাদেরকে সাহায্য করতে উৎসাহী নন।'

'অসম্ভব! কুয়াশা তেমন মানুষই নন। আমি অবশ্য তাঁকে কখনও দেখিনি। তবে তাঁর সম্পর্কে যা যা শুনেছি তা থেকে বলতে পারি যে অসহায়, বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করাই তাঁর আদর্শ। তাঁর কানে আমাদের আবেদন পৌঁছুলে তিনি নিশ্চয়ই সাড়া দেবেন।'

ইয়াকুব রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, 'আমি বরং কন্ট্রোল-রুমে যাই একবার, দেখি কোন মেসেজ এসেছে কিনা।'

শায়লা পারভিন রিভলভারটা ফিরিয়ে দিল ইয়াকুবকে। বলল, 'সাবধানে যেয়ো, ইয়াকুব।'

মালেক বলল, 'আমি মিস শায়লাকে পাহারা দিই।'

দরজা খুলে প্যাসেজে বেরোল ইয়াকুব। দরজা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে মালেক। তালা লাগাবার শব্দ হলো—ক্লিক!

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে দ্রুত এগিয়ে চলল ইয়াকুব।

রেডিও কেবিনটা ডেক হাউসের উপর অবস্থিত। উপরে উঠে প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চলল সে। যেতে যেতে তিন চার বার থমকে দাঁড়াল সে, কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করল। তারপর আবার পা বাড়াল।

রেডিও অপারেটর ইয়াকুবকে দেখে মৃদু হাসল। বলল, 'কোন খবর এখনও আসেনি, স্যার।'

নিরাশ হয়ে বেরিয়ে এল ইয়াকুব।

সান-ডেকে নামল সে। অন্ধকারে ঢাকা চারদিক। রেলিংয়ের পাশ ঘেঁষে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফিরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে সে।

মৃদু পদশব্দ ভেসে এল কোথাও থেকে। তারপরই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল খসখসে ধরনের অদ্ভুত একটা আওয়াজ। আওয়াজটা খুবই মৃদু। ঠিক পাখা ঝাপটাবার শব্দও নয়—সিল্কের কাপড়ের ভাঁজ খোলবার সময় নরম যে ধরনের শব্দ হয় অনেকটা সেই রকম। সেই সঙ্গে বাতাস ভারি হয়ে উঠল অসহ্য একটা কটু গন্ধে।

ইয়াকুব দাঁড়িয়ে পড়েছে। উন্মাদের মত আচরণ করছে সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। হাত দুটো শূন্যে তুলে নিজেকে অদৃশ্য বিপদের হাত থেকে মুক্ত রাখার জন্য সবেগে দোলাচ্ছে সে, ভয়ে সর্বশরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে তার।

'না! না! না! না···।'

বিড় বিড় করে না শব্দটা অবিরাম উচ্চারণ করছে সে, পিছিয়ে যাচ্ছে এলোমেলো পা ফেলে।

অদ্ভুত শব্দটা দ্রুত বাড়ছে। এগিয়ে আসছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে।

বিকট শব্দ হলো রিভলভারের।

ইয়াকুব গুলি করছে। এলোপাতাড়ি গুলি করে চলেছে সে। ছুটতে শুরু করেছে এতক্ষণে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের অন্ধকারে তাকাচ্ছে, আর গুলি করছে।

কিন্তু সেই অদ্ভুত শব্দ কাছাকাছি চলে এসেছে। ইয়াকুব উপর দিকে গুলি করল।

চিৎকার করছে সে, 'বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও···!'

সেই অদ্ভুত শব্দটা উপর থেকে নামছে। মনে হলো শব্দটা নেমে এল ইয়াকুবের উপর। ইয়াকুব মরিয়া হয়ে ছুটল, হোঁচট খেয়ে পড়ল, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে লাগল উন্মাদের মত, স্প্রিঙয়ের মত লাফ দিয়ে দাঁড়াল আবার।

পরমুহূর্তে শব্দ হলো একটা—ধপ্।

আবার পড়ে গেছে ইয়াকুব ডেকের উপর। চিৎকার করছে সে। দুর্বোধ্য স্বর বেরিয়ে আসছে তার গলার ভিতর থেকে। হাত-পা খিঁচছে সে, দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর।

কয়েক মুহূর্ত পর গোঙাতে শুরু করল ইয়াকুব। গোঙাবার শব্দও একসময় স্তিমিত হয়ে এল।

তারপর নিস্তব্ধতা নামল।

আরও খানিক পর, জাহাজের দূর প্রান্ত থেকে মৃদু, অস্পষ্ট শিস দেয়ার শব্দ ভেসে এল।

ইয়াকুবের নিঃসাড়, প্রাণহীন দেহটার কাছ থেকে এরপর আবার সেই শব্দ উঠল—সিল্কের কাপড়ের ভাঁজ খুলছে যেন কেউ। শব্দটা ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে।

দূর থেকে ভেসে আসছে লোকজনের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। জাহাজের যাত্রী এবং কর্মীরা ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না কোন্ দিক থেকে এসেছে গুলির শব্দ।

তিন

অন্ধকার ডেকে পড়ে আছে দুর্ভাগা ইয়াকুবের লাশ। এমন সময় উজ্জ্বল টর্চের আলো এসে পড়ল লাশটার উপর। মৃতদেহটা উপুড় হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। চোখ দুটো এখনও আতঙ্কে বিস্ফারিত, হাতে এখনও ধরা রয়েছে রিভলভারটা। ইয়াকুবের গলায় একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে। গলার ফুটোটার দিকে চেয়ে রইল কুয়াশা কয়েক সেকেণ্ড। দেখে মনে হয় ওই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত টেনে বের করে নেয়া হয়েছে।

হত্যাকারীর পায়ের চিহ্ন খুঁজছে কুয়াশা।

বিমূঢ় দেখাল কুয়াশাকে। ডেকের উপর তার নিজের ছাড়া আর কারও পায়ের চিহ্ন নেই।

কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। নিহত ব্যক্তির কাছাকাছি না এলে হত্যাকারী হত্যা করল কি ভাবে?

উপর দিকে তাকাল কুয়াশা। প্রায় বিশ ফুট উপরে মোটা তার ঝুলছে একটা। টর্চের আলো ফেলতে দেখা গেল তারের গায়ে তাজা লাল রক্তের দাগ রয়েছে।

তারটা মোটা হলেও এমন মোটা নয় যে কোন লোক ওখানে দাঁড়িয়ে ওটা দিয়ে কাউকে খুন করতে পারে।

ডেকের দূর প্রান্তের দিকে এগোল কুয়াশা। স্টিলের একটা পিলারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল। টর্চের আলো ফেলে পরীক্ষা করল পিলারটা। কেউ যদি পিলার ধরে উপরে উঠত তাহলে হাতের বা পায়ের ছাপ থাকত। চকচক করছে পিলারের গা। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এই পিলার কেউ স্পর্শ করেনি বেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

পিলার ধরে উপরে উঠতে শুরু করল কুয়াশা। কাঠবিড়ালীর মত তরতর করে উঠে গেল সে পিলারের মাথার কাছে। এইবার মোটা তারটা ধরে ঝুলে পড়ল সে। তার ধরে ঝুলতে ঝুলতে এগিয়ে চলল কুয়াশা। থামল একসময়। টর্চ জ্বালল এক হাতে। অপর হাত দিয়ে ধরে রেখেছে সে মোটা তারটাকে।

আলোয় পরিষ্কার দেখতে পেল সে—রক্তই। কার রক্ত বলা মুশকিল। সম্ভবত নিহত লোকটারই। কিন্তু এই রক্ত এত উপরের ঝুলন্ত তারে এল কিভাবে সেটা একটা দুর্ভেদ্য রহস্য।

কুয়াশা এই রহস্যের কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পেল না। গোটা ব্যাপারটাই ভৌতিক, অলৌকিক বলে মনে হয়।

আলো নিভিয়ে ফেলল কুয়াশা। ছুটন্ত পদশব্দ এগিয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পর একদল লোককে দেখা গেল। জাহাজের কর্মচারী এরা সবাই। কয়েক জনের হাতে টর্চ রয়েছে।

ঝুলন্ত কুয়াশার নিচ দিয়ে হেঁটে গেল লোকগুলো। তারা টেরই পেল না কুয়াশার অস্তিত্ব।

'ওই দেখো? ওদিকে তাকাও··· কে অমন ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে।'

লাশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল লোকগুলো।

'কে···খুন হয়েছে?'

একজন স্টুয়ার্ড রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল,'গলাটা দেখো—খুনী ফুটো করে দিয়েছে···।'

'বারো নম্বর কেবিনের প্যাসেঞ্জার—ইয়াকুব চৌধুরী। কিন্তু খুন করল কে ওকে···?'

ঝুলতে ঝুলতে সামনের দিকে এগিয়ে চলল কুয়াশা নিঃশব্দে। আট-দশ গজ এগোবার পর একটা অপেক্ষাকৃত উঁচু পিলার পেল সে। পিলারের সঙ্গে ঝুলে থাকা তার ধরে এগোল খানিকদূর, তারপর একটা দড়ি ধরে ঝুলতে ঝুলতে চলে গেল জাহাজের অপর এক প্রান্তে।

নিচে নামল কুয়াশা। খুঁজে বের করল বারো নম্বর কেবিন। দরজাটা খোলা দেখে একটু আশ্চর্য হলো সে। কিন্তু কেবিনের ভিতর ঢুকে দরজা খোলা থাকার কারণটা বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

নিহত ব্যক্তির কেবিনে ইতিমধ্যেই কেউ প্রবেশ করেছিল। কেবিনের সব জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, এলোমেলো করে রেখে গেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোটা কেবিনটা পরীক্ষা করল কুয়াশা। বুক শেলফটা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। ওই একটিমাত্র জিনিসে হাত দেয়া হয়নি। বুক শেলফের বইগুলো সুন্দরভাবেই সাজানো রয়েছে। কেউ কোন জিনিসের খোঁজে এই কেবিনের সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে। কিন্তু জিনিসটা আর যাই হোক, কাগজ জাতীয় কিছু যে নয় তা বুঝতে পারল সে।

ড্রেসিং টেবিলের উপর উল্টে পড়ে আছে একটা শেভিং লোশনের শিশি। টেবিলের উপর থেকে কার্পেটে টপ্ টপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা লোশন পড়ছে তখনও। তারমানে যে লোক এই কেবিনের জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করেছে সে মাত্র কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেছে এখান থেকে।

কার্পেটের উপর সেই লোকের পায়ের ছাপ পাওয়া দুষ্কর। প্যাসেজে বেরিয়ে এল কুয়াশা। কেবিনের দরজার সামনে উবু হয়ে বসল সে। প্লাস্টিকের ব্যাগ খুলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে মেঝেতে পায়ের ছাপ আছে কিনা পরীক্ষা করতে লাগল।

প্যাসেজের অদূরবর্তী বাঁকে একটা হাত দেখা গেল। রিভলভার ধরা লোমশ একটা হাত। রিভলভারটা কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে ধরা রয়েছে। বিকট শব্দে গর্জে উঠল সেটা।

ধোঁয়া এবং বারুদের গন্ধে ভারি হয়ে উঠল বাতাস। রিভলভারের শব্দটা বজ্রপাতের মত শোনাল। চারদিক থেকে ভেসে এল ধ্বনি প্রতিধ্বনি। বুলেটটা সোজা গিয়ে বিদ্ধ হলো কাঠের দেয়ালে।

কুয়াশা যথাসময়ে লাফ দিয়ে সরে গেছে কেবিনের ভিতর। রিভলভারের

সেফটি ক্যাচ সরাবার সময় একটা শব্দ হয়েছিল—ক্লিক। সেই শব্দ পেয়েই লাফ দিয়েছিল কুয়াশা।

কেবিনের ভিতর থেকেই একটা গ্যাস-বোমা ছুঁড়ে মারল কুয়াশা প্যাসেজের শেষ মাথার দিকে। বুম করে শব্দ হলো একটা। সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল প্যাসেজ।

রিভলভারের শব্দ হলো আবার। ব্যর্থ আততায়ী আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ধোঁয়ার বাইরে থেকে এলোপাতাড়ি গুলি করছে সে।

পর পর ছয়টা গুলির শব্দ হলো। তারপর সব নিস্তব্ধ। ইতিমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে কুয়াশা প্যাসেজ ধরে। গ্যাসের ভিতর দিয়ে দম বন্ধ করে ছুটতে ছুটতে শেষ মাথায় পৌঁছুল সে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে পদশব্দ। শত্রু পালাচ্ছে। ধাওয়া করল কুয়াশা।

বাঁক নিয়ে ছুটতে ছুটতে একটা বন্ধ দরজার সামনে বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়াল সে। দরজার গায়ে কাঁধ ঠেকিয়ে চাপ দিল। মড় মড় করে ভেঙে পড়ল দরজার পাল্লা দুটো। দরজার ওপাশে প্রশস্ত একটা করিডর। করিডরটা গিয়ে মিশেছে ডেকের সঙ্গে।

ডেকের দিক থেকে ভেসে আসছে লোকজনের শোরগোলের ছুটন্ত পায়ের শব্দ। ওই ডেকেই ইয়াকুবের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। গুলির শব্দ শুনে জাহাজের কর্মচারীরা লাশ ফেলে ছুটেছে আবার কোথায় কি ঘটল দেখার জন্য।

ডেকের উপর লাশটা পড়ে রইল। আশপাশে কেউ নেই আর। আততায়ীর সন্ধান না পেয়ে ডেকে উঠে এল কুয়াশা। মৃতদেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল সে। লাশের শার্ট এবং প্যান্টের পকেটগুলো সার্চ করে বের করে আনল কিছু খুচরো পয়সা।

পয়সাগুলো বাংলাদেশের নয়। টর্চের আলো ফেলে পয়সার গায়ে আরবী অক্ষর দেখতে পেল কুয়াশা।

মিশরীয় মুদ্রা এগুলো, বুঝতে পারল সে।

নিহত ব্যক্তির কোটের ভিতরের পকেট থেকে পত্রিকার কিছু কাটিং ও সাদা কাগজে আঁকা নক্সা পাওয়া গেল। পত্রিকার কাটিংগুলোর উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল কুয়াশা। প্রতিটি কাগজের টুকরোতেই এরোপ্লেন, বেলুন বা জেপলিন জাতীয় আকাশযান সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক খবরাখবর রয়েছে। সাদা একটা কাগজে হাতে আঁকা একটা বেলুনের ছবি দেখা গেল। অপর একটি কাগজে জেপলিন জাতীয় চুরুটের মত দেখতে একটা আকাশযানের ছবি আঁকা রয়েছে। ছবিটার পাশে সাঙ্কেতিক চিহ্ন রয়েছে। চিহ্নটা এই রকম: YX03.

নিহত ব্যক্তির প্যান্টটা অস্বাভাবিক চওড়া দেখে সন্দেহ হওয়ায় কুয়াশা পায়ের দিক থেকে প্যান্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল। ক্ষীণ একটা সন্দেহ ছিল তার, কিছু লুকানো থাকতে পারে লোকটার হাঁটুর পিছন থেকে। সন্দেহ সত্যে পরিণত হলো। সেলোফিন পেপারে মোড়া একটা ছোট থলি বের করে আনল কুয়াশা মৃতদেহের হাঁটুর পিছন থেকে।

থলিটা খুলতেই ঝলসে উঠল চোখ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল কুয়াশা থলির

ভিতরের মহামূল্যবান জিনিসগুলোর দিকে।

এদিকে জাহাজের অপর দিকে দারুণ গোলমাল শুরু হয়েছে। কুয়াশার গ্যাস বোমায় আক্রান্ত হয়ে পাঁচ ছয়জন জ্ঞান হারিয়েছে। ধোঁয়া দেখে জাহাজে আগুন লেগে গেছে মনে করে সবাই ভয়ে ছুটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। মহা-হই-চইয়ের মধ্যে ইয়াকুবের হত্যাকারী—সে মানুষ হোক বা ভ্যাম্পায়ার হোক—জাহাজ থেকে নিরাপদে চলে গেল সকলের অগোচরে।

মহামূল্যবান থলিটা প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। বিউটি কুইনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় সে এবার। তার সন্ধান পাবার জন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল কে বা কারা তা জানতে হবে।

পা বাড়াতেই বাধা পেল কুয়াশা। একটা প্যাসেজের দিক থেকে তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠের আর্তচিৎকার ভেসে এল।

পরমুহূর্তে শোনা গেল একটি দরজা বন্ধ হবার শব্দ। নারী কণ্ঠের চিৎকার আরও উচ্চকিত হয়ে উঠল।

ছুটল কুয়াশা। ডেক থেকে প্যাসেজে পা ফেলেই টর্চের আলোয় দেখল একটি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করছে একটি অপরূপ সুন্দরী যুবতী, শূন্যে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুঁড়ছে সে উন্মাদিনীর মত।

যুবতীটি ভীষণ ভয় পেয়ে অমন অস্বাভাবিক আচরণ করছে বুঝতে পারল কুয়াশা। সম্ভবত কেবিনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে যুবতী নিজেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার করছে।

যুবতীর আশপাশে কেউ নেই, কিছু নেই। কিন্তু তার হাত ছোঁড়া ও বিস্ফারিত চোখে আতঙ্কের ছায়া দেখে কুয়াশারও মাথার পিছনের চুল খাড়া হয়ে উঠল। দৃশ্যটা ভীতিকর, ভৌতিক।

কুয়াশার টর্চের আলো যুবতীর চোখে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার। কুয়াশাকে দেখতে পেল না সে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে দু'পা সরে গেল সে একপাশে। কুয়াশাকে ছুটে আসতে দেখে ছুটল সে-ও। আতঙ্কিত হরিণীর মত ছুটছে সে প্যাসেজ ধরে চিৎকার করতে করতে।

খানিকদূর এগিয়ে দাঁড়াল যুবতী। একটি কেবিনের দরজায় ঘনঘন মুষ্ট্যাঘাত করল। খুলে গেল দরজা, যুবতী অদৃশ্য হয়ে গেল কেবিনের ভিতর।

পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল প্যাসেজে একটি লোক। লোকটার হাতে একটি উদ্যত রিভলভার রয়েছে। যুবতীও বেরিয়ে এল, দাঁড়াল সে লোকটার পিছনে।

টর্চের আলোয় দূর থেকেই লোকটাকে এবং তার হাতের রিভলভারটাকে দেখতে পেল কুয়াশা। থমকে দাঁড়াল সে।

'কে? কে তুমি? দাঁড়াও···!'

দাঁড়াল না কুয়াশা। পিছন দিকে লাফ দিল সে।

গর্জে উঠল রিভলবার। কুয়াশার মাথার এক ইঞ্চি উপর দিয়ে বাতাসে শিস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। আবার লাফ দিল কুয়াশা ক্যাঙ্গারুর মত। ডেকে পৌঁছে গেল সে। একটা লাইফবোটের পিছনে গা ঢাকা দিল দ্রুত।

শায়লা পারভিন কাঁপা গলায় বলে উঠল, 'লোকটাকে দেখতে পাইনি আমি!

কেবিনের জানালা ভাঙার চেষ্টা করছিল কেউ, ভয়ে বেরিয়ে আসি আমি দরজা খুলে। এমন ভয় পেয়েছিলাম যে কি করছি না করছি খেয়াল ছিল না। মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর দেখি টর্চ নিয়ে ওই লোকটা ছুটে আসছে···। হাদি হুসেন কিংবা উত্তাল মনে করে আমি···।'

মালেক বলল, 'আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকুন। দেখছি শয়তানটা কে! লাইফবোটের আড়ালে লুকিয়েছে। দেখে শুনে মনে হচ্ছে লোকটা নিরস্ত্র। দেখাচ্ছি মজা···।'

এগিয়ে চলল মালেক। পিছু পিছু ভয়ে ভয়ে এগোল শায়লা পারভিন।

লাইফবোটের কাছাকাছি এসে মালেক চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো বলছি! তা-না হলে গুলি করে মাথার খুলি ফুটো করে দেব।'

কোন সাড়া নেই। লাইফবোটের আড়াল থেকে কেউ বেরিয়েও এল না।

সন্তর্পণে এগিয়ে গেল মালেক। রিভলভারটা শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। আরও দু'পা এগিয়ে ঝুঁকে পড়ল সে। লাইফবোটের ওদিকটা শূন্য—কেউ নেই!

'একি! শয়তানটা পালাল কোন্ পথে!'

শায়লা পারভিন এগিয়ে এল। লাইফবোটের পাশেই রেলিং। রেলিং ধরে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকাল সে। দোতলার ডেক দেখা যাচ্ছে, কেউ নেই সেখানে। আরও নিচে দেখা যাচ্ছে পানি।

জাহাজের গায়ে লেগে রয়েছে ছোট একটা মোটরবোট। মোটরবোটে ড্রাইভার ছাড়াও দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত ছুঁড়ে তর্ক করছে তারা দোতলার ডেকে দাঁড়ানো একজন নাবিকের সঙ্গে। মিস শায়লা শুনল ওদের কথাবার্তা। নাবিক লোক দু'জনকে জাহাজে উঠতে দিতে রাজি নয়। লোক দুটো সাংবাদিক। তারা বলছে, সাংবাদিকদের অধিকার আছে খবর সংগ্রহ করার। গোলাগুলির আওয়াজ পেয়েছে তারা। ব্যাপারটা কি জানার জন্য তারা জাহাজে উঠতে চায়। দ্রুত চিন্তা করল শায়লা পারভিন।

মালেকের দিকে তাকাল সে। বলল, 'বুদ্ধি এসেছে মাথায়। পালাতে হবে এই জাহাজ থেকে। এই জাহাজ কোন মতেই নিরাপদ নয় এখন আমাদের জন্যে। বেচারা ইয়াকুবকে শয়তানরা খুন করেছে। তার মানে হাদি হুসেন এবং উত্তাল রয়েছে এই জাহাজে। দ্বিতীয় কোন অঘটন ঘটাবার আগেই নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়া দরকার আমাদের।'

'কিন্তু পালাব কিভাবে!'

'সাংবাদিকদের ওই মোটরবোট—ওটা দখল করব আমরা। এসো—।'

লাইফবোটের কাছ থেকে একহাত দূরেও সরে যায়নি কুয়াশা। লাইফবোটটা উপুড় করে রাখা ছিল। প্রথমে সে ওটার আড়ালে গা ঢাকা দিলেও কয়েক মুহূর্ত পর লাইফবোটটা ধীরে ধীরে উঁচু করে ওটার ভিতর ঢুকে যায় সে।

শায়লা পারভিন এবং মালেকের কথাবার্তা সবই শুনতে পায় সে। ওরা ডেকের উপর দিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই লাইফবোটের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে সে, খানিক দূর এগিয়ে রেলিং টপকায়, দ্রুত নেমে পড়ে দোতলার ডেকে।

দোতলার ডেকে দাঁড়িয়ে নাবিকটা তখনও তর্ক করছে সাংবাদিক আনিস এবং এনায়েতের সঙ্গে—সে কুয়াশার উপস্থিতি লক্ষই করল না। দোতলা থেকে নিচে নামল কুয়াশা সিঁড়ি বেয়ে। অন্ধকার রেলিংয়ের উপরে দাঁড়িয়ে ব্যাগ খুলে নাইলনের কর্ড বের করল সে। তারপর নেমে পড়ল পানিতে।

নিঃশব্দে সাঁতার কেটে মোটরবোটের পিছন দিকে পৌঁছুল সে। নাইলনের কর্ড বাঁধল সে বোটের সঙ্গে। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল পরবর্তী ঘটনার জন্য।

কয়েক মুহূর্ত পরই রেলিংয়ের ধারে হাজির হলো শায়লা পারভিন এবং মালেক। মালেকের হাতে উদ্যত রিভলবার। রেলিং টপকে দড়ির মই বেয়ে তরতর করে নামল সে মোটরবোটের উপর। সাংবাদিকদ্বয়ের দিকে রিভলবার উঁচিয়ে কঠিন কণ্ঠে নির্দেশ দিল সে, 'কোন কথা নয়। যা বলছি, তাড়াতাড়ি করো। মই বেয়ে জাহাজে ওঠো, দু'জনেই। তা না হলে···।'

শায়লা পারভিন নামল বোটে।

নাবিক লোকটা বোবা বনে গেছে। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে দেখছে সে শায়লা পারভিন আর মালেককে। সাংবাদিকদ্বয় ভিজে বেড়ালের মত দড়ির মই বেয়ে উঠে পড়ল জাহাজে।

'ড্রাইভার! বোট স্টার্ট দাও।'

বিনাবাক্যব্যয়ে স্টার্ট দিল ড্রাইভার বোটে। বাঁক নিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে চলল মোটরবোট।

জাহাজের উপর থেকে নাবিক এবং সাংবাদিকদ্বয় স্তম্ভিত হয়ে দেখল বোটের পিছু পিছু একটা ছায়ামূর্তি তীরবেগে এগিয়ে চলেছে···।

তীরে অসংখ্য মানুষের ভিড়। যেদিকে মানুষজন প্রায় নেই বললেই চলে সেদিকে ছুটে চলেছে মোটরবোট। তীরভূমি পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে থাকতে নাইলনের কর্ড খুলে নিল বোটের গা থেকে কুয়াশা। সাঁতার কেটে উঠল সে তীরে। রেখে যাওয়া ব্রিফকেস থেকে ঝটপট পোশাক বের করে পরে নিল সে, নকল দাড়ি আবার লাগাল মুখে, তারপর ছুটতে শুরু করল ব্রিফকেস হাতে নিয়ে।

ভাগ্যক্রমে মোটরবোটটা যেখানে ভিড়েছে সেখান থেকে কুয়াশার মার্সিডিজ গাড়িটা খুব বেশি দূরে নয়। গাড়ির কাছে পৌঁছে সে শহীদের উদ্দেশে বলল, 'ডানদিকের তীরে এইমাত্র একটা মোটরবোট ভিড়েছে। একটি যুবতী এবং একজন লোক রাস্তার দিকে আসছে। সম্ভবত গাড়ি দরকার হবে ওদের। দেখো তো টোপ ফেলে, ওরা তোমার ফাঁদে পা দেয় কি না। এইমুহূর্তে আমি বলতে পারছি না ওরা শত্রু না মিত্র। ওদের গন্তব্য স্থানটা জানতে চাই আমি। ওরা নিজেদের মধ্যে কি আলাপ করে শোনার চেষ্টা করো। সাবধান, ওরা কিন্তু আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে তুমি। আক্রান্ত তুমিও হতে পারো—যাও!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে থামল কুয়াশা। তার কথা শেষ হতে হুস করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা তীরবেগে।

গাড়ি নিয়ে খানিক দূর যাবার পরই হেড লাইটের উজ্জ্বল আলোয় শহীদ সামনে একটা ভাড়াটে ট্যাক্সি দেখতে পেল। ট্যাক্সির ব্যাক ডোর খুলে ধরেছে

ড্রাইভার, ভিতরে উঠছে একটি যুবতী, তার সঙ্গে একজন পুরুষমানুষ। শহীদের গাড়ি কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই ড্রাইভার উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে। ছুটতে শুরু করল ট্যাক্সি। দেরি হয়ে গেছে, সুতরাং কাজ হলো না। অগত্যা ট্যাক্সিকে অনুসরণ করতে শুরু করল ও।

দূর থেকে সবই লক্ষ করল কুয়াশা। ট্যাক্সি এবং মার্সিডিজ খানিক দূর এগিয়েছে মাত্র, এমন সময় দু'জন লোক রাস্তার উপর এসে দাঁড়াল। দ্রুত অদৃশ্যমান গাড়ি দুটোর দিকে দু'জনেই তাকিয়ে আছে, দেখল কুয়াশা।

লোক দু'জনের একজন অস্বাভাবিক মোটা। উচ্চতা বড়জোর পাঁচ ফুট হবে, চওড়ায় প্রায় সেই রকমই। এমন মেদ-সর্বস্ব লোক এর আগে দেখেনি কুয়াশা। লোকটা দেশী নয়, বিদেশী। সম্ভবত, আফ্রিকান। তার সঙ্গের লোকটা সাড়ে পাঁচ ফুটের মত লম্বা। ভাল স্বাস্থ্য। এ লোকটা বাঙালী।

নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে শুরু করল কুয়াশা। আলো এড়িয়ে ছায়ার ভিতর দিয়ে লোক দু'জনের একেবারে কাছাকাছি পৌঁছুতে চায় সে। বাঙালী লোকটাকে চিনতে পারছে সে। জাহাজে এই লোকই তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল।

মোটা লোকটার পিঠে কিছু একটা ঝোলানো রয়েছে, লক্ষ করল কুয়াশা। আরও কয়েক পা এগোবার পর জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে। একটা বেতের ঝুড়ি। ঝুড়িটা আকারে অস্বাভাবিক বড়।

আরবী ভাষায় কথা বলছে মোটা লোকটা, 'সত্যিই কি তুমি ছুঁড়িটাকে দেখেছ, উত্তাল? ভুল করোনি তো?'

বাঙালী লোকটার নাম উত্তাল। সে বিরক্তির সঙ্গে দ্রুত বলে উঠল, 'কী আশ্চর্য! ভুল দেখব কেন! পরিষ্কার দেখলাম ট্যাক্সিতে উঠল দু'জন।'

'তাহলে তো বিপদ। দেখো দেখি চেষ্টা করে, কোন গাড়ি পাওয়া যায় কিনা। ওদেরকে, বিশেষ করে ছুঁড়িটাকে কোন মতেই পালাতে দেয়া চলে না। একবার চোখের আড়ালে চলে গেলে খুঁজে পেতে দেরি হয়ে যাবে।'

রাস্তার এদিক-ওদিক তাকাল উত্তাল।

দেখা গেল দূর থেকে ওদের দিকেই ছুটে আসছে একটা ট্যাক্সি। হাত দেখিয়ে থামাবার চেষ্টা করছে ওরা গাড়িটাকে।

ট্যাক্সিটা থামল।

এমন সময় কুয়াশার পিছন থেকে ছুটে আসতে দেখা গেল একটা গাড়িকে। গাড়িটার উজ্জ্বল হেড লাইটের আলো পড়ল কুয়াশার গায়ে।

হেড লাইটের আলো পড়ল উত্তাল এবং হাদি হুসেনের গায়েও। ট্যাক্সিতে চড়ার আগে দু'জনেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। তাকাতেই দেখতে পেল দীর্ঘদেহী কুয়াশাকে।

'ইয়াল্লা!'

আঁতকে উঠল হাদি হুসেন।

'সেই শয়তানটা! পিছু পিছু এসেছে ব্যাটা!'

উত্তাল বলে উঠল।

কুয়াশার পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল একটা মরিস গাড়ি। আবার অন্ধকার গ্রাস করল তাকে। অন্ধকারে মিশে গিয়ে দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে সরু একটা গলিতে প্রবেশ করল সে। দাঁড়াল। এখান থেকে দেখতে চায় সে শত্রুরা কি করে না করে।

অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। উঁকি দিয়ে তাকাতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো কুয়াশা। কান পাতল সে। অদ্ভুত একটা শব্দ ভেসে এল কানে। সিল্কের কাপড়ের ভাজ খোলার সময় এই ধরনের শব্দ হয়। মৃদু, খসখসে শব্দ। ক্রমশ তার দিকে এগিয়ে আসছে। তীব্র একটা দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে।

জীবনে সহস্রাধিক বার সহস্র ধরনের বিপদে পড়েছে কুয়াশা। লক্ষণ দেখামাত্র সে বুঝতে পারে বিপদটা কি ধরনের।

এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

হঠাৎ কুয়াশা ঘুরে দাঁড়িয়ে গলির ভিতর দিকে ছুটতে শুরু করল।

কুয়াশা যেন প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে উঠেছে। প্রাণপণে দৌড়ুচ্ছে সে। গলির দু'পাশে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিল টপকে কোন বাড়িতে আশ্রয় নেবার কথা ভাবল সে। কিন্তু যে বিপদ পিছু ধাওয়া করে আসছে তার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হলে দ্রুত এবং নিখুঁত আশ্রয় দরকার। পাঁচিল টপকালেই যে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

ছুটছে কুয়াশা অন্ধকার গলির ভিতর দিয়ে। কিন্তু সেই রহস্যময় শব্দটা তার চেয়েও দ্রুত বেগে ধাওয়া করে আসছে তাকে।

নিজের পায়ের শব্দ হঠাৎ যেন অন্যরকম শোনাল। সেই মুহূর্তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল কুয়াশা। ঝুঁকে পড়ে পথের গায়ে হাত বুলাল।

ইট নয়, লোহা ঠেকল হাতে।

বুঝতে অসুবিধে হলো না, একটা ম্যানহোলে পা পড়েছিল তার।

বসে পড়ল কুয়াশা। ম্যানহোলের ঢাকনিটা খোলার চেষ্টা করল।

এগিয়ে আসছে সবেগে সেই রহস্যময় শব্দ। দুর্গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছে বাতাস। শ্বাস গ্রহণ করা অসম্ভব মনে হচ্ছে।

ম্যানহোলের ঢাকনির চারদিকে ধুলোবালি জমে থাকায় সেটা জাম হয়ে গেছে, চেষ্টা করেও এতটুকু নড়তে পারছে না কুয়াশা।

প্রতিটি সেকেণ্ডের দাম লক্ষ কোটি টাকার সমান বলে মনে হচ্ছে কুয়াশার। সাক্ষাৎ মৃত্যু ছুটে আসছে তার দিকে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে। এই বিপদ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ম্যানহোলের ভিতর ঢুকে আশ্রয় নেয়া। বিপদটার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে কোন ভুল ধারণা নেই তার। অন্ধকারে এই অগ্রসরমান বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করবার নেই তার।

এগিয়ে আসছে শব্দটা।

দরদর করে ঘামছে কুয়াশা। সর্ব উপায়ে চেষ্টা করছে সে ঢাকনিটা তুলে ফেলতে, কিন্তু···।

মাথার উপর চলে এসেছে সেই রহস্যময় খসখসে শব্দ। এমন সময় খুলে ফেলল কুয়াশা ঢাকনি। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল তার দেহটা ম্যানহোলের ভিতর। ঢাকনিটা টেনে বসিয়ে দিল ম্যানহোলের মুখে।

ঢাকনির উপর নখ দিয়ে আঁচড়াবার শব্দ হচ্ছে, শুনতে পেল কুয়াশা। কোন পাখি যেন ঢাকনিটা খোলার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। দূর থেকে ভেসে এল দীর্ঘ শিস দেবার আওয়াজ। ঢাকনির উপর থেকে কি যেন উড়ে গেল শূন্যে—সেই রহস্যময় খস্‌খসে শব্দটা ক্রমশ মিলিয়ে গেল দূরে।

ম্যানহোলের ঢাকনি সামান্য একটু উঁচু করে রেখেছিল বলে শব্দগুলো শুনতে কোন অসুবিধে হয়নি কুয়াশার।

অসহ্য দুর্গন্ধটাও ক্রমশ মিলিয়ে গেল বাতাসে, অনুভব করল সে।

কয়েক মুহূর্ত পর ঢাকনি সরিয়ে উঠে এল কুয়াশা পথের উপর। গলির মাথায় পৌঁছুল দ্রুত। কিন্তু ট্যাক্সি বা শত্রুদের কাউকে কোথাও দেখতে পেল না সে।

চার

কুয়াশার আস্তানাটা কর্ণফুলী নদীর ধারে। পাঁচতলা বিল্ডিং।

ড্রয়িংরুমে ঢুকতে দেখা গেল কুয়াশাকে।

কুয়াশাকে দেখে রাজকুমারী ওমেনা বলল, 'কি খবর, কুয়াশা?'

দ্রুত কুয়াশার মাথা থেকে পা অবধি চোখ বুলিয়ে নিল সে।

কুয়াশা বলল, 'খবর ভাল নয়। নতুন ধরনের বিপদের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হও। মি. ডি. কস্টা কোথায়?'

'লাইব্রেরীতে। ঢাকা থেকে রাসেল এসেছে, তার সঙ্গে গল্প করছেন।'

কুয়াশা সোফায় বসল। বলল, 'রাসেল এসেছে ভালই হয়েছে। ডাকো ওদেরকে।'

ওমেনা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ড্রয়িংরুম থেকে। একমিনিট পরই ফিরে এল সে সঙ্গে ডি. কস্টা এবং রাসেলকে নিয়ে।

'বসো, রাসেল।'

রাসেল বসল, 'দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা শুনে ভাবলাম এখানে অ্যাডভেঞ্চারাস কিছু ঘটবেই ঘটবে। পাছে থ্রিল থেকে বঞ্চিত হই, তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। তা আসল ব্যাপারটা কি, কুয়াশা দা?'

ডি. কস্টা মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে সে সিলিংয়ের দিকে। ভুলেও সে তাকাচ্ছে না কুয়াশার দিকে।

কুয়াশা বলল, 'মি. ডি. কস্টা, আপনার রাগ এখনও কমেনি দেখছি।'

ঝট্ করে তাকাল ডি. কস্টা। থমথম করছে মুখের চেহারা। ভারি, অভিমানাহত স্বরে সে বলল, 'রাগ করিয়া লাভ নাই। হামি রাগ করি নাই। কিন্তু হামি মনে করি হাপনি হামার প্রটি অন্যায় অবিচার করিয়াছেন।'

'ব্যাপার কি?'

রাসেল জানতে চাইল।

উত্তর দিল ওমেনা। হাসি চাপার চেষ্টা করতে করতে সে বলল, 'মি. ডি. কস্টা অনুরোধ করেছিলেন পুরস্কারের দশ লক্ষ টাকা যাতে তিনি পান তার ব্যবস্থা যেন কুয়াশা করে দেয়। কিন্তু কুয়াশা রাজি হয়নি।'

কুয়াশা বলল, 'দশ লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা শোনার পর নানারকম

সন্দেহ জাগে আমার মনে। পুরস্কারের ঘোষণাটা আমাকে বিপদে ফেলার একটা ফাঁদ হতে পারে মনে করে আমি শহীদের সঙ্গে পরামর্শ করে আসল রহস্য জানবার জন্য সরাসরি যেতে চাই বিউটি কুইনে। কিন্তু মি. ডি. কস্টা চেয়েছিলেন স্বয়ং বিউটি কুইনে গিয়ে পুরস্কারের ঘোষককে জানাতে যে তিনি আমার সন্ধান পেয়েছেন। এতে দশ লক্ষ টাকা তিনি পেতেন। কিন্তু ওর প্রস্তাব আমি মেনে নিতে পারিনি। আমার নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী রহস্যটার সমাধান করার চেষ্টা করি···।'

রাসেল জানতে চাইল, 'আপনি এখন বিউটি কুইন থেকে এলেন বুঝি? রহস্য কি? জানতে পেরেছেন?'

কুয়াশা ব্রিফকেস খুলে সেলোফিন পেপারের থলিটা বের করে রাসেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল, বলল, 'এই থলির ভিতর কিছু মূল্যবান ডায়মণ্ড আছে। তুমি তো জিওলজির ওপর প্রচুর পড়াশোনা করেছ; পরীক্ষা করে জানাও আমাকে বিস্তারিত। জানো তো বিভিন্ন দেশের ডায়মণ্ড বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে। এগুলো কোন্ এলাকা থেকে এসেছে বলো।'

রাসেল হাত বাড়িয়ে ডায়মণ্ডের থলিটা নিল। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে দেখল সে ডায়মণ্ডগুলো। পনেরো টুকরো আনকাট ডায়মণ্ড।

রাসেল বলল, 'আফ্রিকার ডায়মণ্ড এগুলো। কিন্তু এর দাম যে অনেক। কোত্থেকে পেলেন?'

কুয়াশা বলল, 'আফ্রিকান, তা আমিও অনুমান করেছি। কিন্তু আফ্রিকার কোন্ এলাকার?'

'তা জানতে হলে সময় নিয়ে পরীক্ষা করতে হবে, রেফারেন্স বুক ঘাঁটতে হবে।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক আছে। তার আগে বিউটি কুইনে কি কি ঘটেছে শুনে নাও তোমরা সবাই।'

কুয়াশা একে একে সব ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করল। কুয়াশার কথা শেষ হতে প্রত্যেকে একাধিক প্রশ্ন করল। কিন্তু বেশির ভাগ প্রশ্নেরই উত্তর দিতে অস্বীকার করল কুয়াশা। কারণ অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন মন্তব্য করতে অভ্যস্ত নয় সে।

শুধু ওমেনার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'রক্তশোষক বাদুড় বা ভ্যাম্পায়ারের খুব বড় একটা ভূমিকা আছে এই রহস্যে। বিউটি কুইনে যে নিহত হয়েছে সে ওই রক্তশোষক বাদুড় বা ভ্যাম্পায়ারের শিকার, এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। মৃতদেহের গায়ে কিছু ক্ষত দেখেছি। ছোট ছোট নখের আঁচড় সম্ভবত।'

রাসেল বলল, 'কি সাঙ্ঘাতিক! ভ্যাম্পায়ারের কথা এতদিন গল্প কাহিনীতেই শুনে এসেছি। এখন দেখছি ভ্যাম্পায়ারের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতে হবে!'

কুয়াশা বলল, 'ওমেনা, আমাদেরকে সংঘর্ষের জন্য সবদিক থেকে তৈরি থাকতে হবে। উড়ন্ত ভ্যাম্পায়ারের বিরুদ্ধে অন্ধকারে লড়তে হবে আমাদের। বুঝতেই পারছ, রাতের অন্ধকারে মৃত্যু-ঠোকর মারার জন্য ওরা আসবে। সুতরাং ইনফ্রা-রেড প্রজেক্টর প্রস্তুত রাখো তুমি। অন্ধকারে সবকিছু দিনের আলোর মত পরিষ্কার দেখতে পেতে হবে। ফ্লুয়োরোসকোপিক চশমা আর এমন একটা গ্যাস

তৈরি করবে যা ফুসফুসে প্রবেশ করা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে মানুষ জ্ঞান হারায়। গ্যাসটা যেন মারাত্মক না হয় অর্থাৎ ওই গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে কেউ যেন মারা না যায়। গ্যাস মাস্কগুলোও পরীক্ষা করে দেখবে, সব ঠিক ঠাক আছে কিনা।'

কুয়াশা এবার নিহত ইয়াকুবের পকেট থেকে পাওয়া জেপলিন আঁকা এক টুকরো কাগজ বের করল। চুরুটের মত লম্বা আকাশযান দেখল কিছুক্ষণ। YX03—সাঙ্কেতিক চিহ্নটার দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর কাগজটা ডি. কস্টার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'YX03—এটা একটা সাঙ্কেতিক চিহ্ন; জেপলিন ধরনের একটা আকাশযানের পাশে লেখা রয়েছে। আপনি ঢাকায়, সিভিল এভিয়েশন দফতরে এ ব্যাপারে ফোন করুন। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নের বিশেষ কোন অর্থ আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখবেন। আমার ধারণা, জেপলিন ধরনের কোন আকাশযানের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এটা। আর একটা ব্যাপার। এখানে হেলিকপ্টার আমাদের মাত্র একটা। ঢাকার আস্তানা থেকে আর একটা কপ্টার নিয়ে সরাসরি এখানে চলে আসতে বলুন কামালকে।'

খানিক পর লাইব্রেরীতে দেখা গেল কুয়াশাকে। দৈনিক সংবাদপত্রের কাটিং-এর ফাইলগুলো নিয়ে কাজ শুরু করল সে। ফাইলের উপর লেখা হেডিং দেখে স্মরণ করার চেষ্টা করছিল সে এর আগে শায়লা পারভিনের নামটা কোথায় শুনেছে বা দেখেছে। ঠিক মত মনে না পড়লেও, নামটা যে এর আগে সে শুনেছে বা কোথাও লেখা দেখেছে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না তার মনে।

মাস ছয়েক অতীতের উল্লেখ্য ঘটনা সমূহের একটা ফাইল হাতে তুলে নিল কুয়াশা। এই ফাইলে অভিযানমূলক ঘটনার পেপার কাটিং সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। ফাইলের উপর বন্ধনীর মধ্যে লেখা রয়েছে, 'শুধুমাত্র বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত অভিযানমূলক ঘটনার টুকরো সংবাদ।'

ফাইলটা খুলল কুয়াশা। খানিক পরই একটা পেপার-কাটিং দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। শুধু খবর নয়, পাইলটের পোশাক পরা শায়লা পারভিনের ছবিও রয়েছে পেপার কাটিংয়ে। এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট একটা বিমানের সামনে সহাস্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে শায়লা পারভিন। ছবির নিচেই খবরটা ছাপা হয়েছে।

খবরের হেডিংটা এই রকম:

> মিস শায়লা পারভিনের নিখোঁজ সংক্রান্ত সকল তদন্তের সমাপ্তি। সরকারী মুখপাত্রের সহিত এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে প্রকাশ যে ফ্লাইং ক্লাবের সদস্যা মিস শায়লার সন্ধান লাভের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উদ্ধারকারী সংস্থা একযোগে তদন্ত কার্যের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মাস ছ'য়েক পূর্বে মিস শায়লা অপর দুইজন সদস্যসহ ফ্লাইং ক্লাবের একটি বিমান লইয়া ঢাকা হইতে সিয়ারালিয়ন যাত্রা করেন। তুরস্কের ইজমীর বিমানবন্দর হইতে সর্বশেষবার তৈল নিয়া আকাশে উড্ডয়নের পর বিমানটির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বিমান এবং বিমানের আরোহীদের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তাহা জানিবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তদন্ত কার্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাহারও কাহারও ধারণা, বিমানটি ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। তবে ইহা অনুমান মাত্রই। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকার ধারণা পোষণ করেন, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। বিমানটি এবং বিমানের আরোহীত্রয়ের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে তা রহস্যাবৃতই থাকিয়া গেল। এই রহস্যের সমাধান আর কোনদিন হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

খবরটা এখানেই শেষ নয়। খবরের শেষাংশে শায়লা পারভিন, আবদুল মালেক এবং ইয়াকুব চৌধুরীর ব্যক্তিগত পরিচয় ছাপা হয়েছে।

পদশব্দ শুনে মুখ তুলল কুয়াশা। দোর-গোড়ায় রাজকুমারী ওমেনাকে দেখা গেল। বলল, 'শহীদ খান ফোনে ডাকছেন তোমাকে।'

উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল কুয়াশা। ড্রয়িংরুমে ঢুকে ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলল সে, বলল, 'কুয়াশা বলছি।'

শহীদের গলা ভেসে এল, 'ওদের পরিচয় জানতে পেরেছি আমি কুয়াশা। ওদেরকে অনুসরণ করলেও, ট্রাফিক জ্যামের জন্য হারিয়ে ফেলি ট্যাক্সিটাকে। খানিক পর ট্যাক্সিটাকে হোটেল রেক্স-এর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গাড়ি থামাই। ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে কয়েকটা তথ্য পেয়েছি। সে ওদের কথাবার্তা শুনেছে। শায়লা পারভিন, আবদুল মালেক এবং নিহত ইয়াকুব চৌধুরী সম্মিলিতভাবে তোমার সন্ধান লাভের জন্যে দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।'

'কোত্থেকে বলছ তুমি?'

শহীদ বলল, 'হোটেল রেক্স-এর লবি থেকে। ওরা এই হোটেলে উঠেছে। শায়লা পাঁচতলায়, মালেক ছয়তলায়। একই ফ্ল্যাটে কামরা খালি নেই বলে এই ব্যবস্থা।'

কুয়াশা দ্রুত হাদি হুসেন এবং উত্তালের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানতে চাইল, 'এই রকম চেহারার দু'জন লোককে দেখেছ হোটেলে?'

শহীদ বলল, 'ব্যাপার কি, কুয়াশা! এই তো কয়েক মিনিট আগে দু'জন লোককে হোটেলে ঢুকতে দেখলাম। তোমার বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে···। মোটা লোকটার পিঠে সৌখিন একটা বেতের ঝুড়িও দেখেছি···।'

দ্রুত কণ্ঠে কুয়াশা বলে উঠল, 'শায়লা এবং মালেকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো, শহীদ। কুইক! ওদেরকে বলো, হাদি হুসেন এবং উত্তাল ওই হোটেলে ঢুকেছে। ওদেরকে হোটেল থেকে বের করে আনো—না, তুমি বরং ওদেরকে দরজা-জানালা বন্ধ করে আমার জন্য অপেক্ষা করতে বলো। ওদের সঙ্গে তুমিও থাকো। আমি যাচ্ছি এখুনি···।'

সশব্দে ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল সে ড্রয়িংরুম থেকে।

আট-দশ মিনিট পর হোটেল রেক্স-এর সামনে সশব্দে ব্রেক করে থামল একটা

ট্যাক্সি।

হোটেলের সামনে প্রচুর লোকজনের ভিড়। উত্তেজিত ভাবে কথা বলছে সবাই। কুয়াশা ট্যাক্সি থেকে নেমে সেই ভিড়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কিছু একটা খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে, বুঝতে অসুবিধে হলো না তার।

উত্তেজিত লোকগুলোর কথাবার্তা কানে গেল তার।

'পুলিসে খবর দেয়া হয়েছে? গোলাগুলির ব্যাপার, তার ওপর কিডন্যাপিং!'

বলল হোটেলের একজন বেয়ারা।

অপর একজন বলে উঠল, 'আর খবর দিয়ে কি হবে? ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গুণ্ডা দু'জন এতক্ষণে বহুদূরে চলে গেছে।'

কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'গুণ্ডারা ঢুকল কিভাবে হোটেলে! আর গোলাগুলিই বা হলোটা কার সঙ্গে?'

'চেহারা দেখে কি বোঝা যায় নাকি সাহেব কে গুণ্ডা কে ভাল মানুষ! লোক দু'জন খানিক আগে হোটেলে ঢুকে দুটো রুম ভাড়া নিয়েছিল। গুলি বোধহয় ওরাই ছুঁড়েছে লোকজনকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করার জন্য।

একজন বয় বলে উঠল, 'আমিই তো ওদের বেতের ঝুড়িটা উপর তলায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। আমার কথা শুনে খেপে উঠেছিল দু'জনই। তখনই কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল আমার।'

'কি ছিল বেতের ঝুড়িতে?'

'তা জানি না। তবে ওটা ছুঁতে দিতেও রাজি নয় বলে মনে হচ্ছিল। ভিতর থেকে কেমন ভ্যাপসা, খারাপ গন্ধ বেরুচ্ছিল···।'

শহীদ ব্যর্থ হয়েছে বুঝতে পারল কুয়াশা। হোটেলের ভিতর প্রবেশ করল সে। শহীদের ভাগ্যে কি ঘটেছে জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল মনে মনে। একটা অশুভ চিন্তায় ছেয়ে গেল তার মন।

রিসেপশনে ঢুকল কুয়াশা। রিসেপশনিস্টকে জিজ্ঞেস করে শায়লা পারভিন এবং মালেকের রুম নাম্বার জেনে নিয়ে এগোল এলিভেটরের দিকে।

পাঁচতলায় নামল কুয়াশা এলিভেটর থেকে। নাম্বার মিলিয়ে শায়লা পারভিনের রুমের সামনে দাঁড়াল। কাঁধের ধাক্কায় ভেঙে ফেলা হয়েছে দরজাটা। ভিতরে প্রবেশ করার আগেই সে দেখল রুমের কার্পেটটা গুটিয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এক ধারে। রুমের আর সব আসবাবপত্রও উল্টে দেয়া হয়েছে। প্রায় প্রতিটি জিনিস স্থানচ্যুত করেছে শত্রুরা। এমনকি টেলিফোন যন্ত্রটাও ভেঙে ফেলা হয়েছে।

শায়লার কাছে এমন কিছু ছিল যা শত্রুরা খুঁজে বের করার জন্য সম্ভাব্য সব জায়গায় সন্ধান চালিয়েছে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। নিহত ইয়াকুবের কাছে মূল্যবান ডায়মণ্ড ছিল। শায়লার কাছেও ছিল নাকি? কিসের সন্ধানে রুমটা এমন তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে শত্রুরা?

শায়লা পারভিনের রুম থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ছয়তলায় উঠল কুয়াশা। নাম্বার মিলিয়ে মালেকের রুমে ঢুকল সে।

মালেকের প্রাণহীন দেহ পড়ে রয়েছে কার্পেটের উপর। প্রথমেই লক্ষ করল কুয়াশা, মালেকের প্যান্ট হাঁটু অবধি তোলা। মৃতদেহের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল সে। মালেকের ডান পায়ের হাঁটুর পিছনে মনোযোগ দিয়ে দেখল। দড়ির দাগ দেখল সে। কিছু একটা বাঁধা ছিল হাঁটুর পিছনে, বোঝা যায়। ইয়াকুবের মত মালেকও

মূল্যবান ডায়মণ্ড লুকিয়ে রেখেছিল হাঁটুর পিছনে, অনুমান করল সে।

ইয়াকুবের মতই, মালেকের গলায় একটা ফুটো দেখা যাচ্ছে। রক্তশোষক বাদুড় বা ভ্যাম্পায়ারই যে তার মৃত্যুর জন্য দায়ী তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

কামরাটা পরীক্ষা করল কুয়াশা। শহীদের ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। জানালাগুলো ভিতর থেকে বন্ধ রয়েছে, লক্ষ করল সে।

নিচের তলায় নেমে এল কুয়াশা। হোটেল ম্যানেজার, রিসেপশনিস্ট, বয়-বেয়ারাদের সঙ্গে কথা বলল সে। জানা গেল হাদি হুসেন এবং উত্তাল শায়লা পারভিনকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে হোটেল থেকে। হোটেল থেকে বেরুবার আগে তারা ইলেকট্রিকের মেনসুইচ অফ করে দেয়, গোটা হোটেল অন্ধকারে ডুবে যায়। হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই এমনই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যে ট্যাক্সির নাম্বার লক্ষ করার কথা কারও মাথায় ঢোকেনি।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, অনেকেই শহীদকে হোটেলের ভিতর ঢুকতে দেখেছে, কিন্তু ওকে বেরুতে দেখেনি কেউ। টর্চের আলোয় হাদি হুসেন, উত্তাল এবং শায়লা পারভিনকে দেখেছে সবাই। কিন্তু তাদের সঙ্গে বা পিছনে শহীদকে কেউ হোটেল থেকে বেরুতে দেখেনি।

সকলের সঙ্গে কথা বলে কুয়াশা সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, শহীদ হোটেলের ভিতরই আছে কোথাও। এতগুলো লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে বেরিয়ে গেছে তা বিশ্বাস করা যায় না।

পাঁচতলায় উঠে এল আবার কুয়াশা। শায়লা পারভিনের কামরায় ঢুকল। আগেই সে লক্ষ করেছিল, কামরার খাটের উপর চাদর এবং বালিশ নেই। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। এত বড় হোটেল, বয়-বেয়ারারা বোর্ডারদের সুবিধে অসুবিধের দিকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। চাদর এবং বালিশ কোন কারণে যদি সরিয়ে ফেলা হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা করার কথা।

কিন্তু তা করা হয়নি।

কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকাল কুয়াশা। জানালাগুলো সবই বন্ধ, কেবল একটি ছাড়া। এগিয়ে গেল সে। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতেই হ্যাঁত্ করে উঠল কুয়াশার বুক। নিচে একটা একতলা বাড়ির প্রশস্ত ছাদ দেখা যাচ্ছে। সেই ছাদের উপর একজন পড়ে রয়েছে লম্বা হয়ে। চারদিক থেকে আলো পড়েছে ছাদটার উপর। শহীদের প্যান্ট এবং শার্ট পরিষ্কার চিনতে পারল কুয়াশা। উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে সে।

পাঁচতলা থেকে একতলার ছাদে ফেলে দেয়া হয়েছে শহীদকে।

বেঁচে থাকার কথা নয় ওর।

পাঁচ

জানালার বাইরে মাথা বের করে দিয়ে উপর দিকে তাকাল কুয়াশা। জানালার পাশ ঘেঁষে একটা পানির পাইপ উঠে গেছে উপর দিকে।

জোর গলায় ডেকে উঠল কুয়াশা, 'শহীদ।'

ছাদ বা উপরতলার কোন জানালা থেকে নয়, শহীদের গলা ভেসে এল কুয়াশার পিছন থেকে, 'আমি এদিকে, কুয়াশা।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখল শহীদ রুমের ভিতর ঢুকছে। প্যান্ট-শার্টের বদলে শুধু একটা চাদর জড়ানো রয়েছে ওর গায়ে।

'ব্যাপার কি বলো তো শহীদ?'

শহীদ বলল, 'তোমার মতই ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি রক্তশোষক বাদুড়ের হাত থেকে, কুয়াশা। নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও মালেককে পারিনি। ইতিমধ্যেই জেনেছ নিশ্চয়ই, খুন হয়েছে সে? আর শায়লাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে শয়তানরা…'

কুয়াশা মন দিয়ে শহীদের কথা শুনছে।

'তোমাকে ফোন করার পরই হঠাৎ দেখি আলো অফ হয়ে গেল। শায়লার চিৎকার শুনি আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময়। রিভলভার নিয়ে এই কামরায় ঢুকি, দেখি শায়লা নেই। শায়লাকে এখানে না দেখে আমি করিডর ধরে ছুটতে শুরু করি ছয়তলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে।

অন্ধকার সিঁড়ির কাছে যেতেই গুলি করা হয় আমাকে। একটা পিলারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে গুলি করি আমি সিঁড়ির মাথার দিকে। শত্রুরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে নেমে আসছিল নিচের দিকে গুলি করতে করতে। আমিও গুলি করছিলাম। খানিক পর ছয়টা বুলেটই শেষ হয়ে গেল। শত্রুরা তা টের পেয়েই ধাওয়া করল আমাকে।

বিপদ টের পেয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ফিরে আসি আমি এই কামরায়। কাপড়-চোপড় খুলে ফেলি। প্যান্ট-শার্টের ভিতর কয়েকটা বালিশ গলিয়ে দিয়ে লম্বা একটা ডামি তৈরি করি। জানালার শার্শি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিই নিচের একতলা বাড়িটার ছাদে, যাতে শত্রুরা উপর থেকে দেখে ধরে নেয় আমি পালাতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গেছি। তারপর পানির পাইপ বেয়ে উঠে যাই উপরে। একটা জানালা গলে আশ্রয় নেই একটি কামরায়…।

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছ তুমি শহীদ। ট্যাক্সি ড্রাইভার, শায়লা পারভিন এবং মালেকের কথা শুনে আর কিছু জানতে পেরেছ?'

'ওদের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারেনি। একদল লোক ক্রীতদাসের চেয়েও কষ্টে দিন কাটাচ্ছে—এই ধরনের কিছু বলেছে ওরা। ড্রাইভারের কথা শুনে মনে হলো, শায়লা পারভিন, ইয়াকুব, মালেক—বহু লোকের সঙ্গে ওরা তিনজনও বন্দি ছিল কোথাও। ওরা পালিয়ে এসেছে কোনক্রমে। বাকি সবাই এখনও বন্দি হয়ে আছে।'

কুয়াশাকে গম্ভীর দেখাল। বলল, 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, রহস্যের গভীরতা ক্রমশ বাড়বে আরও।'

কুয়াশার আস্তানায় ফিরে এল ওরা।

রাসেল অপেক্ষা করছিল ড্রয়িংরুমে। শহীদকে দেখে সহাস্যে বলল, 'শহীদ ভাই, রহস্যের গন্ধ পেয়ে এসে পড়েছি ঢাকা থেকে।'

শহীদ বলল, 'ভাল করোনি। শুধু রহস্য নয়, রহস্যের সঙ্গে রক্তশোষক বাদুড়ও আছে।'

রাসেল বলল, 'রক্তশোষক বাদুড়ই থাক আর মানুষখেকো রাক্ষসই থাক, আপনাদের সঙ্গে থাকলে ভয় করি না কাউকে।'

কুয়াশা বলল, 'তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে?'

রাসেল পকেট থেকে বের করে ডায়মণ্ডের খণ্ডগুলো টেবিলের উপর রাখল। বলল, 'হয়েছে। কিন্তু বিশেষ কিছু জানতে পারিনি, ভাইয়া। এগুলো আফ্রিকার জিনিস, সন্দেহ নেই। কিন্তু আফ্রিকার কোন্ এলাকার জিনিস তা বলা সম্ভব নয়। এর আগে বিশ্ববাজারে এই ধরনের মূল্যবান পাথর খুব কম দেখা গেছে। গত চার-পাঁচ বছর আগে থেকে এই ধরনের পাথর বাজারে আসতে শুরু করে। অন্য সব ডায়মণ্ডের চেয়ে এগুলো আলাদা। এগুলোর ঔজ্জ্বল্য অস্বাভাবিক বেশি। ডায়মণ্ডের মধ্যে এগুলো সেরা ডায়মণ্ড। কিন্তু এর উৎসস্থল বা রপ্তানী কেন্দ্র সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। আপনার লেটেস্ট রেফারেন্স বুকে মন্তব্য করা হয়েছে এই ডায়মণ্ড সম্পর্কে। বলা হয়েছে যে বা যারাই বিশ্ব-বাজারে এই ডায়মণ্ড ছেড়ে থাকুক, এর উৎসস্থল গোপন রাখার জন্য পরিকল্পিত উপায়ে সে বা তারা চেষ্টা করছে। কারণটাও অজ্ঞাত।'

কুয়াশা বলল, 'ভারি আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না?'

রাসেল বলল, 'খুবই।'

ওমেনা ড্রয়িংরুমে ঢুকল। তার হাতে হ্যারিকেন দেখা যাচ্ছে একটা। হ্যারিকেনের মত দেখতে হলেও চিমনি নেই। চিমনির জায়গায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত ইস্পাতের একটা জাল দেখা যাচ্ছে। ওমেনার অপর হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ।

হ্যারিকেনটা টেবিলের উপর রাখল সে। তারপর চামড়ার ব্যাগ থেকে বের করল কয়েক জোড়া বড় আকারের চশমা। সেগুলো নামিয়ে রাখল সে টেবিলের উপর।

ডি. কস্টা ড্রয়িংরুমে ঢুকে, খুক্ করে কাশল।

মুখ না তুলেই মুচকি একটু হেসে কুয়াশা জানতে চাইল, 'কি খবর, মি. ডি. কস্টা?'

ডি. কস্টা এগিয়ে এসে কুয়াশার মুখোমুখি একটা সোফায় বসল ধীরেসুস্থে। বলল, 'মি. কামালকে ফোন করিয়াছি। টিনি আসিটেছেন, 'কস্টার উড়াইয়া। সিভিল এভিয়েশন ডফটর হইটে বলিল—টার আগে বলুন টো বস্, ব্লু-বার্ড নামক একটি আকাশযানের কঠা হাপনার মনে আছে কিনা?'

কুয়াশা বলল, 'মনে নেই মানে? ব্লু-বার্ড জেপলিন জাতীয় আকাশযান ছিল। ব্রিটেনের গ্লাসগো থেকে আফ্রিকার আবিদ অভিমুখে যাত্রা করে জেপলিন ব্লু-বার্ড। পরীক্ষামূলক অভিযান পরিচালনা করছিল ফ্লাইং ক্লাবের একদল শৌখিন সদস্য। তাদের মধ্যে, যতদূর মনে পড়ে, একজন বাঙালীও ছিল। সে আজ বছর বারো আগের কথা। ব্রিটেন থেকে রওনা হবার তিন চার দিন পর নিখোঁজ হয়ে যায় ব্লু-বার্ড। সন্দেহ করা হয় ভূমধ্যসাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে সেটা। আজ পর্যন্ত ব্লু-বার্ড এবং

তার আরোহীদের কোন খবর পাওয়া যায়নি। শুধু পাইলটের লাশ আবিষ্কৃত হয়েছিল ভূমধ্যসাগরে। ব্লু-বার্ডের ভাগ্যে কি ঘটেছে তা আজও একটা বিরাট রহস্য হয়ে রয়েছে মানুষের মনে।'

ডি. কস্টা সবজান্তার মত মাথা দোলাল। বলল, 'কারেক্ট। হাপনি ঠিকই সব নিউজ রাখেন। হাউএভার, দ্যাট ব্লু-বার্ড, টাহারই সাঙ্কেটিক নাম ছিল YXO3। ইয়েস, একজন বাঙলাদেশীও ছিল, টাহার নাম উট্টাল চৌড়ুরী।'

কুয়াশা কথা বলল না। কিন্তু তাকে বেশ চিন্তিত দেখাল।

অকস্মাৎ ঝনঝন শব্দে সবাই চমকে উঠল।

ক্রিং···ক্রিং···

ফোনের বেল বাজছে।

হাত বাড়িয়ে রিসিভার ধরল কুয়াশা। বলল, 'কুয়াশা বলছি।'

অপরপ্রান্ত থেকে কেউ দাঁতে দাঁত চেপে শাসিয়ে উঠল, 'আমাকে তুমি চিনবে না। আমি উত্তাল। তোমার মৃত্যুদূত। কথা বলে অকারণে সময় নষ্ট করার লোক নই আমি। শুধু জানতে চাই, ডায়মণ্ডগুলো দেবে কি দেবে না। হ্যাঁ বা না—একটা উত্তর শুনতে চাই।'

কয়েক সেকেণ্ড কথা বলল না কুয়াশা। কণ্ঠস্বরটা চিনতে পারছে সে—উত্তালই কথা বলছে।

কুয়াশা শান্ত গলায় বলল, 'ইয়াকুবকে খুন করেছ তোমরা ওই ডায়মণ্ডের জন্য, তাই না? মালেককেও খুন করেছ···'

উত্তালের কঠিন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ইয়াকুবকে বা মালেককে কেন খুন করেছি তার ব্যাখ্যা তোমাকে দিতে হবে নাকি? তবে শুনে রাখো, যাকে আমরা পছন্দ করি না তাকে খুন করতেই আমরা অভ্যস্ত। দরকার হলে তোমাকে, তোমার বন্ধু-বান্ধবকেও খুন করব। এই কাজটা আমরা খুব সহজেই সারতে পারি। ইয়াকুবের এবং মালেকের হত্যাকাণ্ড দেখে নিশ্চয়ই তা বুঝতে পেরেছ। যাক, এই প্রথম এবং শেষবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, কুয়াশা, আমাদের সঙ্গে টক্কর দিতে এসো না। তুমি যত বড়ই বাহাদুর হও, তোমার বিষ দাঁত ভেঙে দিতে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড লাগবে আমাদের। যাক, ডায়মণ্ডগুলো ফেরত চাই আমরা। ইয়াকুবের ডায়মণ্ডগুলো নয়—শায়লার ডায়মণ্ডগুলো। ইয়াকুবেরগুলো রেখে দিতে পারো নিজের কাছে। তোমাকে ভিক্ষা দিলাম ওগুলো। কিন্তু শায়লার ডায়মণ্ডগুলো ফেরত চাই আমরা। শায়লার কাছে ওগুলো নেই। কোথায়, কার কাছে রয়েছে জিনিসগুলো তা সে বলতে চাইছে না। আমাদের সন্দেহ তোমার বা তোমার কোন লোকের কাছে কোন না কোন উপায়ে পাচার করে দিয়েছে সে গোপনে। এখন জানতে চাই শুধু, ফেরত দেবে কিনা।'

কুয়াশা বলল, 'দুঃসাহসের সীমা নেই তোমার, স্বীকার করছি। মরবার জন্য পাখা গজিয়েছে তোমার। দু'জন লোককে খুন করেছ, শায়লাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছ—জানো এর শাস্তি কি হতে পারে?'

'মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করো না বলছি! শাস্তির ভয় উত্তাল বা হাদি হুসেন করে না। ডায়মণ্ডগুলো ফেরত দেবে না তাহলে তুমি?'

'না। তবে শায়লাকে মুক্তি দিলে ডায়মণ্ডগুলো ফেরত দেবার কথা ভেবে

দেখতে পারি।'

'অসম্ভব! ওকে হয় খুন করব, নয়তো হাদির সঙ্গে বিয়ে দেব। হাঃ হাঃ হাঃ···।'

উৎকট উল্লাসে গলা ছেড়ে হাসতে শুরু করল উত্তাল। একসময় হাসি থামিয়ে সে বলল, 'এই তোমার শেষ কথা? দেবে না ফেরত?'

'না। এই আমার শেষ কথা।'

উত্তাল অপরপ্রান্তের রিসিভার নামিয়ে রাখল।

মুখ তুলল কুয়াশা। সবাই চেয়ে আছে অধীর উত্তেজনায় তার দিকে। কিন্তু শহীদকে ড্রয়িংরুমের কোথাও দেখল না সে।

একমুহূর্ত পরই লাইব্রেরী থেকে ড্রয়িংরুমে ফিরে এল শহীদ। দ্রুত বলল, 'লাইব্রেরীর ফোন ব্যবহার করে অপারেটরের সঙ্গে কথা বলেছি আমি। উত্তাল এই মাত্র ফোন করেছে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ থেকে।'

সপ্রশংস দৃষ্টিতে শহীদের দিকে তাকিয়ে থেকে কুয়াশা বলল, 'ধন্যবাদ, শহীদ। এখুনি ছাদের উপর চলে যাও তুমি। 'কপ্টার তৈরি আছে—খুঁজে বের করো উত্তালকে···।'

ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল শহীদ ড্রয়িংরুম থেকে।

শহীদ বেরিয়ে যেতেই প্রশ্ন করার জন্য তৈরি হলো সবাই। কিন্তু কুয়াশা চোখ বন্ধ করে কিছু চিন্তা করছে দেখে কেউ কোন প্রশ্ন করল না।

একমুহূর্ত পরই চোখ খুলল কুয়াশা।

মুচকি একটু হাসল সে। বলল, 'মি. ডি. কস্টা, এখুনি আপনাকে হোটেল রেক্স-এর কাছে যেতে হবে। হোটেলের পিছনে একটা একতলা বাড়ি আছে, সেই বাড়ির ছাদে পড়ে আছে কয়েকটা বালিশ একত্রিত অবস্থায়, প্যান্ট-শার্ট পরানো। তাড়াতাড়ি যান, নিয়ে আসুন···।'

'ইয়েস, বস্।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ডি. কস্টা সোফা ছেড়ে। লাফাতে লাফাতেই বেরিয়ে গেল সে ড্রয়িংরুম থেকে।

ওমেনা জানতে চাইল, 'কি ব্যাপার, কুয়াশা?'

মুচকি হাসিটা আর একবার দেখা গেল কুয়াশার ঠোঁটে। বলল, 'একটু পরই জানতে পারবে।'

'ও কিসের শব্দ···।' রাসেল হঠাৎ বলে উঠল?

ওমেনাও শুনল শব্দটা। ছাদে ভারি কিছু পতনের শব্দ হলো যেন।

'শহীদ ভাই তো অনেক আগেই চলে গেছেন 'কপ্টার নিয়ে। তিনি কি ফিরে এলেন?'

কুয়াশা বলল, 'না। কামালের আসার কথা ঢাকা থেকে একটা 'কপ্টার নিয়ে, সেই এসেছে বোধহয়।'

কুয়াশার অনুমানই ঠিক। তিন মিনিট পর পাইলটের পোশাকে সজ্জিত সদা হাস্যময় কামাল প্রবেশ করল ড্রয়িংরুমে। কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'কেমন আছ?'

কুয়াশা মৃদু হেসে বলল, 'ভাল।'

বসল কামাল কুয়াশার মুখোমুখি। বলল, 'কি ব্যাপার বলো তো? এমন জরুরী তলব?'

কুয়াশা সংক্ষেপে সকল ঘটনা বলল কামালকে।

গল্প গুজবে মিনিট পনেরো কাটল। একসময় ডি. কস্টাকে দেখা গেল দোরগোড়ায়। প্যান্ট-শার্ট পরানো তিনটে বালিশ বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে নিয়ে এসেছে সে।

'প্যান্ট-শার্ট খুলে ফেলুন, মি. ডি. কস্টা।'

কুয়াশা নির্দেশ দিল।

ডি. কস্টাকে সাহায্য করল রাসেল।

'একটা একটা করে তিনটে বালিশের কভার, খোলস ছুরি দিয়ে ছিঁড়ে ফেলো, রাসেল।'

পকেট থেকে ছোট একটা ছুরি বের করল রাসেল। একটা বালিশের কভার ছিঁড়ল সে।

রাশ রাশ তুলো বেরিয়ে পড়ল।

'ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখো কিছু পাও কিনা।'

তুলোর ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিতেই কিছু একটা ঠেকল হাতে, বের করে আনল সেটা রাসেল।

সেলোফিন পেপারের একটা থলি তুলে ধরল রাসেল চোখের সামনে।

'কি এটা? কি আছে এর ভিতরে?'

'ডায়মণ্ড!' কুয়াশা বলল্।

রাসেল দ্রুত থলির মুখের বাঁধন খুলে ফেলল। থলিটা উপুড় করে ধরতেই অস্বাভাবিক বড় বড় ডায়মণ্ডের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা খণ্ড ছড়িয়ে পড়ল কার্পেটের উপর।

'মাই গড! মিলিয়নস অ্যাণ্ড মিলিয়নস ডলারের ডায়মণ্ড হামি কাঁধে করিয়া বহিয়া আনিয়াছি, অঠচ টাহা জানিটে পারি নাই!'

কুয়াশা বলল, 'দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন আপনি। তার বদলে দশ লক্ষ ডলারের বেশি মূল্যের ডায়মণ্ড পেয়ে গেছেন। মনে কোন খেদ নেই তো আর?'

ওমেনা বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কুয়াশা।'

কুয়াশা বলল, 'এই বালিশগুলো শহীদ শায়লা পারভিনের হোটেল রুমের জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল নিচে, শত্রুদেরকে ধোঁকা দেবার জন্য। শায়লা বালিশের ভিতর লুকিয়ে রেখেছিল ডায়মণ্ডগুলো—কিন্তু শহীদের তা জানবার কথা নয়। ব্যাপারটা আমার মনেও উদয় হয়নি। উত্তাল ফোন করে জানাল যে শায়লার ডায়মণ্ডগুলো তারা পায়নি—কথাটা শুনেই বুঝলাম জিনিসিগুলো হোটেলেই থাকার কথা। কিন্তু হোটেলের কামরায় সেগুলো নেই। তাহলে গেল কোথায়? অনুমান করলাম, ওই বালিশের ভিতরই আছে···।'

'বুঝেছি।'

টেবিলের উপর রাখা ওয়্যারলেস সেটটা জীবন্ত হয়ে উঠল হঠাৎ।

ভেসে এল শহীদের কণ্ঠস্বর।

ছয়

' 'কপ্টার থেকে তরল ফ্লুরোসেন্ট লোশন উত্তালের ট্যাক্সির ছাদে স্প্রে করে দিয়েছি আমি। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটছে ট্যাক্সিটা। 'কপ্টার নিয়ে অনুসরণ করতে কোন অসুবিধেই হচ্ছে না আমার। ফ্লুরোসকোপিক চশমা পরে আছি, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, জ্বলজ্বল করে রেডিয়ামের মত জ্বলছে ট্যাক্সির ছাদে লোশন। একাই ছিল ট্যাক্সিতে উত্তাল সম্ভবত। খানিক আগে অন্ধকার একটা গলির মুখে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিল। আলোর অভাবে কিছুই দেখতে পাইনি আমি। তবে, মনে হয়, হাদি হুসেন এবং শায়লাকে ট্যাক্সিতে তুলে নিয়েছে সে গলির মুখ থেকে। ট্যাক্সি ছুটছে দক্ষিণ দিকে।'

কুয়াশা বলল, 'উত্তাল বা হাদি হুসেন মুখে যত বড় বড় কথাই বলুক, ওদের পরিকল্পনা অন্যরকম বলে মনে করি আমি। ইয়াকুব এবং মালেককে খুন করেছে ওরা, শায়লাকে বন্দি করেছে—সুতরাং এখন ওরা অকারণে বিপদে জড়িয়ে পড়তে চাইবে না। হুমকি দিলেও আমাদের বিরুদ্ধে কিছু করবে বলে মনে হয় না। আমার বিশ্বাস, ওদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে—এখন ওরা কেটে পড়বার চেষ্টা করবে। শহীদ, অনুসরণ করে যাও। আমরাও গাড়ি নিয়ে বের হচ্ছি। ওদেরকে পালাতে দেয়া হবে না।'

কুয়াশার শেষের কথাগুলো কঠিন শোনাল।

উঠে দাঁড়াল সবাই সোফা ছেড়ে।

কুয়াশা বলল, 'তোমরা সবাই তৈরি তো? প্রয়োজনীয় কোন জিনিসই নিতে যেন ভুল না হয়।'

ব্যস্ত হয়ে পড়ল সবাই। যে যার ব্যাগ ভরে নিল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিয়ে।

ডায়মণ্ডগুলো তুলে রাখল কুয়াশা একটা আয়রন সেফে।

আচমকা ভেসে এল শহীদের কণ্ঠস্বর। 'কুয়াশা! আবছা আলোয় দেখলাম ছুটন্ত ট্যাক্সি থেকে উত্তাল কাউকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল রাস্তার পাশে! দেহটা পরিষ্কার দেখেছি আমি।'

সবাই চেয়ে আছে কুয়াশার দিকে। সবাই গম্ভীর, চিন্তান্বিত।

ইতিমধ্যেই দু'জন লোককে খুন করেছে উত্তাল এবং হাদি হুসেন। সম্ভবত আরও একজন খুন করল সে। বড় বেশি বাড়াবাড়ি করছে শয়তান দুটো।

নির্দেশ দিল কুয়াশা, 'নিচে নামো, শহীদ। দেখো কার দেহ ওটা।'

'ঠিক আছে।'

বলল শহীদ।

কুয়াশার পিছন পিছন রাজকুমারী ওমেনা, কামাল, ডি. কস্টা এবং রাসেল বেরিয়ে এল করিডরে। এলিভেটরে চড়ে নামল ওরা নিচে।

মার্সিডিসে চড়ল ওরা সবাই। ড্রাইভিংসীটে উঠে বসল কুয়াশা। রেডিও-ওয়্যারলেস সেটটা অন করল সে।

শহীদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'রাস্তার পাশে উঁচু একটা মাটির ঢিবিতে নামছি

আমি···।'

ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে 'কপ্টারের যান্ত্রিক কোন শব্দ ভেসে আসছে না। কারণ, রকেটে যে ধরনের সলিড ফুয়েল ব্যবহার করা হয়, কুয়াশার 'কপ্টারের বিশেষ ধরনের এঞ্জিনে সেই সলিড ফুয়েল ব্যবহার করা হয়। নামার বা ওঠার সময়ই শুধু রোটর ব্লেড ব্যবহার করা হয়—তখন শব্দ শোনা যায়।

খানিক পর আবার শহীদের গলা শোনা গেল, 'কুয়াশা! লোকটা ট্যাক্সি ড্রাইভার। ড্রাইভার ট্যাক্সিতেই ছিল—এখন বুঝতে পারছি।'

'বেঁচে আছে?'

কুয়াশা জানতে চাইল।

'না। মাথায় একটা ক্ষতচিহ্ন, সম্ভবত বুলেটের। ওরা জাত-খুনী! ঠাণ্ডা মাথায় অকারণে খুন করতে এদের হাত কাঁপে না।'

কুয়াশা থমথমে গলায় বলল, 'ওদের খুন করতে আমাদের হাতও এতটুকু কাঁপবে না! তুমি এখন ঠিক কোথায়, শহীদ?'

'সাতকানিয়ার কাছাকাছি। সম্ভবত মাইল তিনেক সামনে সাতকানিয়া শহর···।'

মার্সিডিজের স্পীড বাড়িয়ে দিল কুয়াশা। স্পীডমিটারের কাঁটা কাঁপতে লাগল ৯০-এর ঘরে পৌঁছে।

তিন মিনিট পর শহীদ জানাল, 'হাইওয়ে ছেড়ে ট্যাক্সি একটা সাইড রোডে ঢুকেছে। এদিকে অনেকগুলো কৃষি ফার্ম আছে বলে জানি।'

কুয়াশা একহাতে ধরে আছে গাড়ির হুইল। তার অপর হাতে ওয়্যারলেস সেটের মাউথপীস, সেটা মুখের সামনে তুলে ধরে কথা বলে উঠল সে, 'সাতকানিয়া থেকে মাইল দশেক পিছনে এখনও আমরা। তুমি পিছিয়ে এসে তুলে নিতে পারবে আমাদেরকে 'কপ্টারে? ট্যাক্সিটাকে হারিয়ে ফেলার ভয় থাকলে দরকার নেই···।'

'হারাবার ভয় নেই। বাঁক নিচ্ছি আমি···।'

দুই মিনিট পর মাথার উপর দেখা গেল 'কপ্টারের লাল আলো। গাড়ি থামাল কুয়াশা।

প্রশস্ত রাস্তার উপর নেমে এল 'কপ্টার।

ইতিমধ্যে ফ্লুরোসকোপিক চশমা পরে নিয়েছে সবাই। যে যার ব্যাগ নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। 'কপ্টারের দিকে ছুটল সবাই একসঙ্গে।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার আকাশে উড়ল 'কপ্টার। মিনিট পাঁচেক পর শহীদ বলল, 'ওই যে দেখা যাচ্ছে সামনে।'

সবাই দেখল জ্বলজ্বল করে জ্বলছে লিকুইড ফ্লুরোসেন্ট লোশন ট্যাক্সির ছাদে। অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাটি থেকে অনেক উঁচুতে 'কপ্টারটা।

নিচের রাস্তা দিয়ে ছুটে চলেছে ট্যাক্সিটা। হেডলাইট জ্বলছে, কিন্তু সেই আলোয় সামনের রাস্তার কিছুটা আলোকিত দেখাচ্ছে মাত্র। রাস্তা বা রাস্তার আশপাশের এলাকা সম্পর্কে কিছুই জানার উপায় নেই। দূরে দূরে দুটো একটা আলোর ক্ষীণ টুকরো কদাচ চোখে পড়ছে কি পড়ছে না।

কুয়াশা বলল, 'শহীদ, এক কাজ করো। ট্যাক্সিটাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাই আমরা। বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে রাস্তার ওপর নামাও 'কপ্টার। ওমেনার তৈরি কয়েকটা গ্যাস বোমা রাস্তার উপর ফাটিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করব আমরা। ট্যাক্সি রাস্তা অতিক্রম করার সময় শত্রুরা আক্রান্ত হবে গ্যাসে। 'কপ্টার এমন এক জায়গায় নামাও যেখানে রাস্তা খুব সুবিধের নয়। ভাঙাচোরা রাস্তা দেখে ওরা স্পীড কমাবে—তখনই আক্রান্ত হবে গ্যাসে। ফলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে না। ওদেরকে আমরা জীবিত বন্দি করতে চাই।'

ডি. কস্টা বলে উঠল, 'বণ্ডি করিবার পর উহাডেরকে হামার হাটে ছাড়িয়া ডিবেন, প্লীজ। ইহা হামার অনুরোড। উহাডের চামড়া টুলিয়া নিয়া হামি লঙ্কা গুড়া ছিটাইয়া ডিটে চাই!'

রাসেল বলল, 'ওদেরকে বন্দি করে জেরা করলেই জানা যাবে ডায়মণ্ডগুলো কোথা থেকে এসেছে।'

কুয়াশা বলল, 'আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ওদের কাছ থেকে পেতে চাই আমি। শতাধিক লোক ক্রীতদাসের মত বন্দি জীবন কাটাচ্ছে—এ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য না জানা পর্যন্ত দুর্ভাগা লোকগুলোকে উদ্ধারের কোন চেষ্টা করা সম্ভব হবে না। ওদের সম্পর্কে জানার পর থেকে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছি।'

শহীদ 'কপ্টারের কন্ট্রোল প্যানেলের সুইচ, লিভার ইত্যাদি নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত করে তুলেছে। ট্যাক্সিকে পিছনে ফেলে মাইল কয়েক সামনে চলে এসেছে 'কপ্টার। মাটির খুব কাছাকাছি দিয়ে উড়ছে এখন 'কপ্টার। সার্চ লাইট জ্বেলে নিচের রাস্তা পরীক্ষা করছে সে। মিনিট দু'য়েক পর কথা বলল ও, ' 'কপ্টার নামাচ্ছি!'

'খুব সুন্দর জায়গা পেয়েছ,' মন্তব্য করল কুয়াশা।

রাস্তার উপর নামল 'কপ্টার। রাস্তার দু'পাশে হালকা বনভূমি। রাত বেশ হয়েছে, এদিকের রাস্তায় যানবাহন বড় একটা দেখা যায় না।

নির্জন, অন্ধকার রাস্তা। সার্চ লাইট অফ করে দিল শহীদ। একে একে নামল সবাই নিচে। কুয়াশার হাতে হ্যারিকেনের মত দেখতে ইনফ্রা-রেড আলোক নিক্ষেপক যন্ত্রটা দেখা যাচ্ছে। অন্ধকার রাস্তা আলোকিত হয়ে উঠেছে। ওদের প্রত্যেকের চোখে রয়েছে ফ্লুরোসকোপিক চশমা।

খালি চোখে ইনফ্রা-রেড আলো দেখা সম্ভব নয়।

দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে কুয়াশা। সবাই অনুসরণ করছে তাকে। কিছুদূর এগিয়েই থামল সে। সামনেই একটা বাঁক। এদিকে রাস্তাটা এবড়োখেবড়ো, উঁচু-নিচু।

বাঁকের কাছাকাছি দাঁড়াল কুয়াশা। গ্যাস-মাস্ক পরল সে। কাউকে কিছু বলতে হলো না, সবাই তার মত একটা করে গ্যাস-মাস্ক পরে নিল।

সকলের দিকে একবার করে তাকাল কুয়াশা। তারপর নিজের ঢোলা আলখেল্লার পকেট থেকে বের করল গোটা চারেক গ্যাস বোমা।

একটা একটা করে চারটে বোমাই সামনের বাঁকের দিকে ছুঁড়ে দিল কুয়াশা। ঢুপ্ ঢুপ্ শব্দে বিস্ফোরিত হলো বোমাগুলো।

বাতাস নেই বললেই চলে। বোমাগুলো ফাটতেই সাদাটে ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল সামনের জায়গাটা।

হালকা কুয়াশার মত ধোঁয়া দেখে শত্রুরা কোনরকম সন্দেহ করবে বলে মনে হয় না। সন্দেহ করবার সময়ও তারা পাবে না। বাঁক নিলেই ধোঁয়ার মধ্যে প্রবেশ করবে ট্যাক্সি।

অপেক্ষার পালা এখন।

সময় বয়ে চলেছে। কান পেতে আছে সবাই। ঘনঘন তাকাচ্ছে সবাই কুয়াশার দিকে। সবাই জানে, অত্যন্ত শক্তিশালী শ্রবণেন্দ্রিয় রয়েছে কুয়াশার। সাধারণ মানুষ যা শুনতে পায় না, কুয়াশা তা অনায়াসে শুনতে পায়।

'কিছু শুনতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল ওমেনা।

কুয়াশা বলল, 'না।'

ওমেনা গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেষ্টা করলে অনেক অদৃশ্য ঘটনা সম্পর্কে প্রায় সত্যের কাছাকাছি বর্ণনা দিতে পারে। চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল সে কুয়াশার পাশে।

চিন্তিত দেখাচ্ছে কুয়াশাকে। এত দেরি হবার তো কথা নয়। এতক্ষণে ট্যাক্সিটা পৌঁছে যাবার কথা রাস্তার বাঁকে।

চোখ মেলল ওমেনা। বলল, 'ট্যাক্সিটা অন্য দিকে চলে গেছে। অন্তত এদিকে আসছে না সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারছি।'

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। কারও মুখে কোন কথা নেই। কি ঘটেছে বুঝতে বাকি রইল না কারও। শত্রুরা হয় তাদের ফাঁদের কথা টের পেয়ে গেছে নয়তো তাদের গন্তব্যস্থান অন্য দিকে বলে এদিকে আসেনি···।

ছুটল কুয়াশা। তাকে অনুসরণ করল সবাই।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুয়াশা।

বলল, 'ও কিসের শব্দ!'

সবাই শুনতে পেল যান্ত্রিক শব্দটা।

রাসেল বলল, 'ট্যাক্সিটা আসছে নাকি?'

কুয়াশা বলল, 'না। ট্যাক্সির শব্দ নয় ওটা রাসেল। শব্দটা ভাল করে লক্ষ করো। ওটা একটা প্লেনের শব্দ। এক ইঞ্জিন বিশিষ্ট সেসনা প্লেন, সম্ভবত।'

সাত

ঝোপ-ঝাড়, হালকা বনভূমির পর উন্মুক্ত প্রান্তর।

বিরাট, বিস্তীর্ণ এই পাহাড়ী এলাকায় প্রচুর পরিমাণে কাজুবাদামের চাষ হচ্ছে। প্রতি বছর এই সময়টায় বাদাম খেতে এক ধরনের ক্ষতিকারক পোকার আক্রমণ হয়। বিশাল এলাকা জুড়ে খেত, তাই ওষুধ ছিটাবার জন্য কৃষি দফতর একটা প্লেন ঢাকা থেকে এখানে বছরের এ সময়টায় পাঠায়। তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে ওষুধ ছিটাবার কাজ শেষ করে সেসনা প্লেনটা আবার ঢাকায় ফিরে যায়।

ঘন অন্ধকারে ঢাকা চারদিক। প্লেন রাখার অস্থায়ী হ্যাঙ্গারটা শূন্য। হ্যাঙ্গারের সামনে কয়েকজন শার্ট-প্যান্ট পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। নিচু স্বরে কথা বলছে তারা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই চোখ তুলে তাকাচ্ছে অন্ধকার আকাশের দিকে। খুব বেশিক্ষণ হয়নি, প্লেনটা আকাশে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

কয়েকশো একর জমির মালিক ওবায়দুল সরকার কথা বলছে। কৃষি দফতরের অফিসার জাকির হোসেনের সঙ্গে প্রায় তর্কই হচ্ছে তার।

ওবায়দুল সরকারের বক্তব্য, 'কাজটা ভাল হয়নি।'

'খারাপটা হয়েছে কি? হাদি হুসেন আর উত্তাল বলছে, ডায়মণ্ড খনির মালিক ওরা। অদূর ভবিষ্যতে তারা আমাদেরকে টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দেবে আরও। ওদেরকে বিশ্বাস করা দোষের কিছু হয়নি। তাছাড়া, ওরা প্লেন চালাতেও জানে না। আমাদের লোককে নিয়ে গেছে তাই। আমাদের পাইলট এনামুল কবীর বুদ্ধিমান তো বটে, সাহসীও। সে ওদেরকে সুন্দরবনে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবে। তোমার ভয়ের কারণটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না। এমন কল্পনাতীত সুযোগটা হাতছাড়া করা উচিত হত? চার লাখ টাকা! আমরা দু'জন এক লাখ করে, এনামুল কবীর দু'লাখ। ছেলেখেলা কথা নাকি! সারাজীবনে এক লাখ টাকার মুখ দেখার কথা ভাবতে পারতে? তুমি কি ভাবছ ওরা প্লেনটা নিয়ে পালাবে? কিন্তু স্বাভাবিক বুদ্ধিতে কি মনে হয় বলো তো? আফ্রিকায় যাবে ওরা। ছোট্ট একটা প্লেন নিয়ে কেউ আফ্রিকার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার কথা ভাবতে পারে?'

ওবায়দুল সরকার বলল, 'বেশ। যা হবার হয়েছে। দেখা যাক কি হয়। ভালয় ভালয় এনামুল কবীর প্লেন নিয়ে ফিরে এলেই হয় এখন। কবে নাগাদ ফিরবে বলে মনে করো?'

'আগামীকালই ফিরবে। সুন্দরবনে ওরা আজ রাতেই পৌঁছে যাবে। সকালে রওনা হবে, পৌঁছে যাবে বেলা বারোটা একটার দিকে।'

ওবায়দুল বলল, 'তাহলে ভালই। আমি কিন্তু···'

'চুপ!' হঠাৎ উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে বলে উঠল অপর একজন লোক।

'কি হলো।'

কাছাকাছি কেউ থাকলেও, অন্ধকারে তাকে দেখতে পাবার কথা নয়।

ওবায়দুল বলল, 'আমিও কেমন যেন একটা শব্দ পেলাম।'

'হ্যাঁ। পায়ের শব্দ। কিন্তু এই অন্ধকারে কে আসবে···?'

জাকির হোসেন চিৎকার করে উঠল, 'কে?'

কেউ সাড়া দিল না। কিন্তু নিকটবর্তী জঙ্গলের ঝোপ-ঝাড় নড়ে উঠল।

'কিছু না, শিয়াল-টিয়াল হবে।'

জাকির হোসেন বলল, 'তবু, সাবধানের মার নেই। হাদি হুসেনরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছিল মনে আছে? কারা যেন অনুসরণ করছিল ওদেরকে। যাকগে, আমাদেরকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না। সব আলোচনার শেষ হোক এখানেই। যে-যার বাড়ি ফিরি চলো।'

ইনফ্রা-রেড হ্যারিকেন নিয়ে ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল কুয়াশা। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে।

শহীদ ছাড়া বাকি সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করল। কোথায় গিয়েছিল কুয়াশা, কি কি জানতে পেরেছে সে—ইত্যাদি প্রশ্ন।

কুয়াশা কারও কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'আমাদেরকে যেতে হবে সুন্দরবনে। কিন্তু তার আগে ওয়্যারলেসে খবর পাঠাতে হবে আমার লোকদের।'

আকাশে উড়ল 'কপ্টার। চট্টগ্রাম শহরের দিকে চলল ওরা।

সবাই গম্ভীর। কুয়াশা অনেক ব্যাপার জানতে পেরেছে, অথচ কিছু প্রকাশ করছে না।

খানিক পর অবশ্য নিজে থেকেই মুখ খুলল কুয়াশা। বলল, 'হাদি হুসেন আর উত্তাল চৌধুরী স্থানীয় একদল অসৎ লোকের সহযোগিতায় পালিয়েছে। বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিল ওরা, বোঝা গেছে। ছোট্ট একটা প্লেন নিয়ে সুন্দর বনের দিকে গেছে ওরা। সুন্দরবনের ঠিক কোথায় তাদের গন্তব্যস্থান তা আমি জানতে পারিনি।'

ওবায়দুল এবং জাকিরের কথোপকথন ওদের কাছ থেকে মাত্র পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে শুনেছে কুয়াশা। যা যা সে শুনেছে সব বলল ধীরে ধীরে।

এরপর ওদের মধ্যে বিশেষ কোন কথাবার্তা হলো না। ডি. কস্টা গুন গুন করে গান গাইতে শুরু করল। কিন্তু বিশ মিনিট পর দেখা গেল সীটে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে সে। তার নাক ডাকার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

ক'মিনিট পর সবাই নড়েচড়ে বসল। 'কপ্টার পৌঁছে গেছে। ডি. কস্টা ঘুমাচ্ছে দেখে রাজকুমারী ধাক্কা দিল তার গায়ে। চোখ মেলে পিট পিট করে তাকাল ডি. কস্টা। ভীষণ বিরক্ত হয়েছে সে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে উঠল সে, 'কালারফুল স্বপ্ন ডেকিটেছিলাম। হামি আফ্রিকার রানী ইনাপুবাটিককে বিবাহ করিয়া কিং হইয়া গিয়াছি···হাণ্ডেড অ্যাণ্ড টোয়েনটি ফোর সন্টানের পিটা হইয়াছি···।'

'ব্যস! ব্যস!' ওমেনা বলে উঠল, 'ভালই করেছি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে। নইলে আর ক'মিনিট স্বপ্ন দেখার সুযোগ পেলে আপনি কয়েক হাজার সন্তানের পিতা হয়ে যেতেন। ফ্যামিলি প্ল্যানিং আপনি একাই ব্যর্থ করে দিতেন আর একটু হলে···।'

কুয়াশা 'কপ্টার থেকে নামতে নামতে বলল, 'ওমেনা, ফুয়েলের ব্যবস্থা করো তোমরা। শহীদ, আমার সঙ্গে এসো। যার যার ব্যাগ-ব্যাগেজ পরীক্ষা করে দেখে নাও তাড়াতাড়ি। আমরা খানিক পরই রওনা হব।'

কন্ট্রোলরুম থেকে শক্তিশালী ওয়্যারলেস সেটের মাধ্যমে কুয়াশা তার বিভিন্ন আস্তানায় খবর পাঠাতে সময় ব্যয় করল প্রায় আধঘণ্টা।

খুলনার আস্তানায় লোকজনের সংখ্যা এই মুহূর্তে কম। যে দশ-বারো জন আছে তাদের মধ্যে থেকে আবার পাঁচজন গেছে সুন্দরবনে। সেখানে তারা অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করে আছে। ওয়্যারলেস সেট একটা আছে বটে, কিন্তু সেটা তেমন শক্তিশালী নয়।

কুয়াশা খুলনার অনুচর হেদায়েত উল্লাকে নির্দেশ দিল, 'তুমি একটা স্পীডবোট নিয়ে এখুনি রওনা হয়ে যাও আমাদের সুন্দরবনের ক্যাম্পের উদ্দেশে। ওয়্যারলেস সেটটা নিতে ভুলো না। আমি আজ রাতেই পৌঁছুব খুলনায়, তারপর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। ইতিমধ্যে তুমি সুন্দরবনে কোন প্লেন বা সন্দেহজনক চরিত্রের

লোকজন দেখা গেছে কিনা জেনে নেবে। আমার বিশ্বাস, হাদি হুসেন আর উত্তাল চৌধুরীর একটা আস্তানা আছে ওখানে। অদ্ভুত আকৃতির কোন আকাশযান নামতে পারে সুন্দরবনের কোথাও।'

এরপর কুয়াশা পটুয়াখালির আস্তানার সঙ্গে যোগাযোগ করল। সেখান থেকে তার অনুচর বাহাদুর খান মজলিশ জানাল, 'বেশ খানিক আগে শহরের উপর দিয়ে ছোট একটা প্লেন উড়ে গেছে।...না, দেখিনি, ভাইয়া, শব্দ শুনেছি শুধু।'

'কোন্‌দিকে গেছে বলে মনে হয়?'

মজলিশ জানাল, 'পশ্চিম দিকে, ভাইয়া।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক আছে। আবার সেই প্লেনের শব্দ পেলে আমাকে জানাবে। আমি খুলনায় যাচ্ছি।'

সেট অফ করে দিয়ে কুয়াশা শহীদের দিকে তাকাল। বলল, 'হাদি হুসেন আর উত্তাল আফ্রিকার উদ্দেশে পাড়ি দেবার আগেই ধরতে হবে ওদের। ওদের সঙ্গে কিংবা ওদের পিছু পিছু যেতে হবে আমাদের।'

শহীদ বলল, 'অবশ্যই। কিন্তু ওদের সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না, কুয়াশা। তাছাড়া, রক্তচোষা বাদুড়-এর সঙ্গে ক্রীতদাস বা ডায়মণ্ড মাইন-এর কি যে সম্পর্ক তাও কিছু বুঝতে পারছি না।'

কুয়াশা বলল, 'বুঝতে আমিও পারছি না। সেই জন্যেই হাদি হুসেনদেরকে পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না। ওরা একবার চোখের আড়ালে চলে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'ইতিমধ্যে কতদূর চলে গেছে ওরা তাই বা কে জানে।'

কুয়াশা বলল, 'নিরাশ হয়ো না। আমার বিশ্বাস এত তাড়াতাড়ি বাংলাদেশ ত্যাগ করে যেতে পারেনি ওরা। শহীদ, তুমি সবাইকে নিয়ে কপ্টারে চড়ো। আমি মহুয়াকে ফোন করেই যাচ্ছি।'

মেঘে ঢাকা নিকষ কালো রাত। উঁচু আকাশ দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ছুটে চলেছে কুয়াশার 'কপ্টার। শহরগুলোর উপর দিয়ে যাবার সময় দুটো একটা ক্ষীণ আলোর বিন্দু অনেক নিচে দেখা গেল, তারপর আবার নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ঘন দেয়াল, কিছুই দেখবার উপায় নেই।

'খুলনায় প্রবেশ করেছি আমরা,' কামাল বলল।

ওমেনা জানতে চাইল, 'আস্তানায় পৌঁছেই আমরা কিছু না কিছু খবর পাব, তাই না, কুয়াশা?'

কুয়াশা সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'আশা করছি।'

'চোখ দুইটিকে নিয়া বড্ডই প্রবলেমে পড়িয়াছি।'

কামাল জানতে চাইল, 'কি রকম?'

'বণ্ড হইয়া যাইটেছে বারবার, আই মীন ঘুম পাইটেছে।'

ওমেনা বলল, 'বিচুটি পাতা, লবণ আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে তৈরি একটা পাউডার আছে আমার ব্যাগে। ছড়িয়ে দেব খানিকটা আপনার চোখে? অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুম আসবে না।'

হেসে উঠল কামাল, বলল, 'ঘুম তো আসবেই না, মহানন্দে ধেই ধেই করে নাচবেন আপনি।'

ডি. কস্টা অগ্নিদৃষ্টি হানল ওমেনা এবং কামালের দিকে। রাগে সে কথাই বলতে পারল না কিছুক্ষণ। তারপর, ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছেড়ে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'হামি আগেই সণ্ডেহ করিয়াছিলাম, হাপনারা আমার বিরুড্ডে একটা ডল টৈরি করিয়াছেন। ইচ্ছা করিলে হামিও একটা ডল টৈরি করিটে পারি, কিন্টু বৃহট্টর স্বার্টে হামি টা চাহি না। টবে, হামাকে হাপনারা ডুর্বল মনে করিবেন না। ইচ্ছা করিলে হামি হাপনাদেরকে এক হাত দেকাইটে পারি।'

রাসেল বলল, 'মি. ডি. কস্টা, আমি আপনার সঙ্গে আছি।'

ঝট করে তাকাল ডি. কস্টা রাসেলের দিকে, মুখ ভেংচে বলে উঠল, 'হামি আপনার সাটে নাই! হামি একাই একশো, হাপনাকে ডলে নিব কোন্ ডুঃখে!'

নড়েচড়ে বসল ডি. কস্টা, 'টবে শুনুন, হামার নিজের সম্পর্কে ডুটো একটা কঠা বলি। আজি হইটে ডশ বছর পূর্বে হামি জেরুজালেমের এক অভিজাট এলাকায় বাস করিটাম। মুসলিম এবং খ্রীষ্টানডের মড্যে একবার টুমুল ডাঙ্গা লাগিল। হামি খ্রীষ্টান হইলেও খ্রীষ্টানডের পক্ষে ডাঙ্গায় যোগ ডিলাম না, নিউট্রাল রহিলাম, ফলে, খ্রীষ্টানরা হামার উপর খেপিয়া গেল। টাহার উপর হামি ডুই ডলকে একট্রিট করিয়া ঝগড়া মিটাইয়া ডিবার চেষ্টা করিটেছি ডেকিয়া উভয় সম্প্রডায় হামার উপর খেপিয়া উঠিল। ডুই ডলই ডিসিশন নিল, হামাকে মার্ডার করিবে, কারণ হামি টাহাডের উভয় পক্ষের ডুশমন। একডিন, রাস্টা ডিয়া একা হাঁটিটেছি, ডেকি ডুই ডিক হইটে ডুই ডলের গুণ্ডা পাণ্ডারা হামাকে মার্ডার করিবার জন্য ছুটিয়া আসিটেছে।'

'তারপর!' সাগ্রহে জানতে চাইল কামাল, 'আপনি নিশ্চয়ই হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন?'

ডি. কস্টা কামালের কথায় কান না দিয়ে বলে চলল, 'ডুই ডল হামার কাছাকাছি আসিয়া ডাঁড়াইল। ডুই ডলের মাঝখান হামি একা। খ্রীষ্টানরা বলিল, মি. ডি. কস্টা, হাপনি হামাডের ডলে যোগ ডিন। মুসলিমরা বলিল, মি. ডি. কস্টা, হাপনি হামাড়ের ডলে যোগ ডিন।'

'আপনি কি করলেন?'

'হামি বলিলাম, টোমরা ডুই ডলই নীটিহীন, আডর্শ হীন। হামি ন্যায়ের ডলের লোক, হামি কাহারও ডলে যোগ ডিব না। টোমরা হামার ডলে যোগ ডাও। হামার এই কঠা শুনিয়া ডুই ডলই হৈ-হৈ রৈ-রৈ করিটে করিটে আমার ডিকে ছোরা, টরোয়াল, বর্শা উঁচাইয়া ছুটিয়া আসিল। বুঝিটে পারিলাম, উহারা হামাকে মার্ডার করিবে। হামি হোঃ হোঃ শব্দে হাসিয়া উঠিলাম।'

'হেসে উঠলেন? বলেন কি! পাগল হয়ে গিয়েছিলেন বুঝি?' ওমেনা সবিস্ময়ে জানতে চাইল।

কামাল বলল, 'মৃত্যু অবধারিত জেনেও আপনি হেসে উঠলেন? অসম্ভব···!'

ডি. কস্টা বিরক্তির সঙ্গে ধমকে উঠল, 'আহ! ঠামুন! হামার কঠা শুনুন, টারপর যটো পারেন ক্রিটিসাইস করিবেন।'

'বলুন তাহলে। কি হলো তারপর?'

কামাল এবং ওমেনা সাগ্রহে চেয়ে রইল ডি. কস্টার দিকে। ডি. কস্টা হাসতে হাসতে শুরু করল আবার, 'হাসিটে হাসিটে হামি হামার কোটের ডুই পকেট হইটে বাহির করিলাম ডুইটি মহামূল্যবান পুস্টক। একটি পবিট্র কোরান, অন্যটি পবিট্র বাইবেল। ডুই হাট ডিয়া পুস্টক ডুইটি ডুই ডলের ডিকে বাড়াইয়া ঢরিয়া রাখিলাম। ডেকিলাম, ডুই ডলই ঠমকাইয়া ডাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। হামি মুসলিমদের ডিকে টাকাইয়া বজ্র কণ্ঠে বলিলাম, টোমরা যাহারা খোডাকে মানো, যাহারা পবিট্র কোরান পাকে বিশ্বাস রাখো, টাহারা হামার ডলে যোগ ডাও। খ্রীষ্টানডের দিকে টাকাইলাম টারপর। বলিলাম, টোমরা যাহারা সত্যিকার যীশুর সন্টান, যাহারা পবিট্র বাইবেলে বিশ্বাস রাখো, টাহারা হামার ডলে য়োগ ডাও।'

'তারপর!'

'যাডুমন্ট্রের মটো কাজ হইল। ডুইজন একজন করিয়া আগাইয়া আসিল ডুইডল হইটেই। টাহার পর, ডেকাডেকি, সকলেই আমার ডলে যোগ ডিল। উহাডেরকে হামি বলিলাম, খ্রীষ্টান অ্যাণ্ড মুসলিম ভাই ভাই। টোমরা অকারণে ডাঙ্গা করিটেছ। হামার উপর এই ডাঙ্গা ঠামাইবার ডায়িট্ব ডাও, টোমাডের উপকার হইবে টাহাটে। বলিলাম, কামন, সবাই প্রতিজ্ঞা করি, আজ হইটে ডাঙ্গা করিব না। শুড়ু টাহাই নহে, যাহারা ডাঙ্গা করিবে টাহারা হামাডের এনিমি, টাহাডেরকে শায়েস্টা করিব। বলিলাম, এই ডাঙ্গার জন্য মুসলিম বা খ্রীষ্টানরা ডায়ী নহে, ডায়ী ইহুডিরা। টাহাডের চর আমাডের মড্যে লুকাইয়া আছে। টাহাডেরকে খুঁজিয়া বাহির করিটে হইবে। হামার শেষ কঠাটা সকলের মনে দাগ কাটিল। সডলবলে হামরা শহরে প্রবেশ করিলাম, খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করিলাম ইহুডি চরডের, টাহাডের বণ্ডি করা হইল। সেই ডিন হইটে ডাঙ্গা ঠামিল। হামি মুসলিম এবং খ্রীষ্টানডের মড্যে পপুলার হইলাম। হামার জনপ্রিয়টা এটেই বাড়িয়া উঠিল যে ডুই সম্প্রডায়ের নেটারা হামাকে লাটসাহেব পডের জন্য ইলেকশনে ডাঁড়াইবার জন্য অনুরোড করিটে লাগিল—বাধ্য হইয়া হামাকে পলাইটে হইল। জেরুজালেম হইটে পালাইয়া হামি ঢাকায় চলিয়া আসিলাম···।'

'পালাতে হলো? সে কি! কেন?'

ডি. কস্টা মৃদু হাসিতে বাঁকাচোরা মুখটাকে আরও এবড়োখেবড়ো করে তুলে বলল, 'জানেনই টো, হামি ক্ষমটালোভী নই। ক্ষমটা পাইলে মানুষ আডর্শহীন হইয়া পড়ে, জনপ্রিয়টা হারাইয়া ফেলে। হামি তখনও টাহা চাহি নাই, আজও টাহা চাই না। পাওয়ারের প্রটি হামার লোভ ঠাকিলে কটো ডেশ জয় করিটে পারিতাম, কটো রাজা-উজীরকে পরাজিট করিয়া আলেকজাণ্ডার ডি গ্রেটকে ম্লান করিয়া ডিটে পারিটাম, কিন্টু টাহা করি নাই শুড়ু একটি কারণে—ক্ষমতার প্রটি হামার কোন লোভ নাই। হাপনারা হামাকে জব্ড করিটে চেষ্টা করেন, প্রায়ই ব্যাপারটা লক্ষ করি, কিন্তু কিছু বলি না। ইচ্ছা করিলে, হামি একাই হাপনাডেরকে ঘোলাপানি খাওয়াইটে পারি, কিন্টু···।'

কুয়াশার কণ্ঠস্বর শোনা গেল এমন সময়। ডি. কস্টা চুপ করে গেল তাই।

কুয়াশা বলল, ' 'কস্টার নামছে। আমরা খুলনার আস্তানায় পৌঁছে গেছি।'

—

কুয়াশা ৫৬

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৬

এক

খুলনা-আস্তানার ইনচার্জ হেদায়েত উল্লা রওনা হয়ে গেছে ঘণ্টাখানেক আগে সুন্দরবনের দিকে। ওয়্যারলেস সেট নিয়ে গেছে সঙ্গে। স্পীডবোট নিয়ে রওনা হয়েছে সে, 'আশা করা যায় আরও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুন্দরবনের ক্যাম্পে পৌঁছে যাবে সে।'

হেদায়েত উল্লার সহকারী ওসমান কুয়াশাকে অভ্যর্থনা জানাল। পথ দেখিয়ে নিচে নিয়ে গেল সে। মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে রাজকীয় ব্যবস্থা করেছে সে খানাপিনার।

খিদে পেয়েছিল ওদের। বিনাবাক্যব্যয়ে খেতে বসল সবাই। খেতে খেতেই কুয়াশা স্থানীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে প্রশ্ন করে জেনে নিল বিশদ।

কুয়াশা বলল, 'আচ্ছা, ওসমান, খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছিল খুলনার আকাশে লম্বা চুরুটের মত একটা অদ্ভুত আকৃতির আকাশযান দেখা গেছে কিছুদিন আগে। দেখেছ নাকি তুমি?'

ওসমান বলল, 'দেখেছি, ভাইয়া। খালিচোখে এক কি দু'বার মাত্র দেখা গেছে। আমরা দেখেছি বিনকিউলার দিয়ে। অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছিল সেটা। খুব ছোট দেখাচ্ছিল, সূর্যের আলোয় চকচক করছিল। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বলে মনে হচ্ছিল···।'

'কোন্‌দিক যাচ্ছিল?'

'পশ্চিম দিকে।'

শহীদ বলল, 'তার মানে সুন্দরবনের দিকে।'

ঘণ্টা দেড়েক পর ওয়্যারলেসে যোগাযোগ স্থাপন করল কুয়াশা হেদায়েত উল্লার সঙ্গে।

উৎসাহব্যঞ্জক খবর পাওয়া গেল। হেদায়েত উল্লা জানাল, 'ভাইয়া, ক্যাম্পের লোকজন এখন থেকে কয়েক ঘণ্টা আগে একটা প্লেনের আওয়াজ পেয়েছে। ক্যাম্পটা মরণখোলার ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্লেনটা অর্পনগাশিয়ার দিকে গেছে বলে ওদের ধারণা। ওদিকটা খুবই দুর্গম। মানুষজন নেই, কেউ পা বাড়াতে সাহস্‌ই পায় না।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক আছে। আমরা 'কপ্টার নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওখানেই থাকো। আবার যদি প্লেনের শব্দ পাও, সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

হেদায়েত উল্লা বলল, 'ভাইয়া, আর একটা খবর। ক্যাম্পের লোকেরা ক'দিন আগে লম্বা আকারের একটা আকাশযান দেখেছে বলছে···।'

'কোন্ দিকে যেতে দেখেছে?'

'দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ অর্পনগাশিয়ার দিকেই।'

'ঠিক আছে। আমরাও ক্যাম্প থেকে স্পীডবোট নিয়ে অর্পনগাশিয়ার দিকে যাব। বোটটাকে তৈরি রাখো। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছুচ্ছি আমরা।'

সকাল হয়ে এসেছে।

ঘন সবুজ বনভূমির উপর দিয়ে ছুটে চলেছে হেলিকপ্টার। নিচের দিকে চেয়ে আছে সবাই। ডি.কস্টা বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে দেখছে।

'দুঃখ রহিয়া গেল, আজ অবডি একটা রয়েলবেঙ্গল টাইগার শিকার করিটে পারিলাম না।'

রাসেল বলল, 'সে চেষ্টা করলে দু'রকম বিপদে পড়বেন আপনি। এক, রয়েল বেঙ্গল টাইগার আপনাকে পেটে পুরে ফেলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবে। দুই, স্থানীয় পুলিস আপনার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করবে। বাঘ শিকার-করা এখন নিষিদ্ধ।'

শহীদ লক্ষ করছিল, 'কুয়াশা বারবার পুব দিকে তাকাচ্ছে। পুবাকাশে এক খণ্ড কালো মেঘ দেখা যাচ্ছে।'

'কি দেখছ, কুয়াশা?'

কুয়াশা বলল, 'স্পীডবোট নিয়ে হাদি হুসেনদেরকে খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে। জঙ্গলের ঠিক কোথায় তারা কে জানে। সবচেয়ে ভাল হত যদি 'কপ্টার নিয়ে সন্ধান চালানো যেত। কিন্তু তাও সম্ভব নয়। 'কপ্টারকে ওরা দেখে ফেলবে সহজেই। সেক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্যই আমাদের ব্যর্থ হবে।'

একটু বিরতি নিয়ে কুয়াশা আবার বলল, 'পুবাকাশে একটুকরো কালো মেঘ দেখতে পাচ্ছ? ভাবছিলাম, আকাশটা যদি মেঘে ঢাকা পড়ে যেত তাহলে বড় সুবিধে হত আমাদের। 'কপ্টার নিয়েই খোঁজ করতে পারতাম।'

মিনিট সাতেক পর শহীদ বলল, 'তোমার আশা পূরণ হতে যাচ্ছে সম্ভবত, মেঘ দ্রুত এগিয়ে আসছে, ঢেকে ফেলছে আকাশ।'

রাসেল পিছন থেকে মন্তব্য করল, 'প্রকৃতি দেখা যাচ্ছে আমাদের স্বপক্ষেই রয়েছে।'

আরও খানিক পর নিশ্চিত হওয়া গেল। ঘনকালো মেঘ গোটা আকাশটাই প্রায় ঢেকে ফেলল।

ওয়্যারলেসে জানিয়ে দিল কুয়াশা হেদায়েত উল্লাকে, 'আমরা ক্যাম্পে নামছি না আপাতত। তুমি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে এখুনি রওনা হয়ে যাও অর্পনগাশিয়ার দিকে। সতর্ক থেকো।'

কানেকশান বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে কুয়াশা বলল, 'বৃষ্টি আসবে। ঝড় এলেই কিন্তু বিপদ।'

ক্রমশ উপরে উঠতে লাগল 'কপ্টার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মেঘের উপর চলে গেল ওরা। নিচের বনভূমি ঢাকা পড়ে গেল বিশাল মেঘের আড়ালে। মেঘের ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে নিচটা।

ইতিমধ্যে সবাই চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। এক একজন

এক একটা দিক বেছে নিয়েছে। নিচের দিকে চেয়ে আছে সবাই অসীম ধৈর্য নিয়ে। মেঘের ফাঁক দেখলেই সেদিকে তাকাচ্ছে, 'যদি দেখা যায় কিছু।'

ম্যাপের দিকে চোখ রেখে 'কপ্টার চালাচ্ছে কুয়াশা।

'অর্পনগাশিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা,' বলে উঠল সে এক সময়।

শহীদ বলল, 'মালঞ্চ নদীর উপর রয়েছে 'কপ্টার। কুয়াশা, আরও উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে হবে মাইল ছয়েক।' মাইল ছয়েক এগিয়ে 'কপ্টারকে শূন্যে দাঁড় করাল কুয়াশা।

'কিছুই দেখা যাচ্ছে না?' চোখে বিনকিউলার ঠেকিয়ে জানতে চাইল সে।

মেঘ এদিকটায় খুব হালকা। নিচের বনভূমি বেশ দেখা যাচ্ছে। তবে, ঘন মেঘের টুকরো এসে প্রায়ই আড়াল সৃষ্টি করছে।

শহীদ বলল, 'এবার পশ্চিম দিকে যেতে হবে।'

পশ্চিমে যাত্রা করল 'কপ্টার।

মিনিট দু'য়েক পরই চেঁচিয়ে উঠল কামাল, 'ইউরেকা! পেয়েছি! শহীদ, দেখতে পাচ্ছিস? আমাদের ঠিক নিচে!'

কেউ দেখছিল পুবদিকটা, কেউ পশ্চিম দিকটা। কামালের চিৎকার শুনে সবাই ব্যস্ত সমস্ত হয়ে তাকাল সরাসরি নিচের দিকে।

কিন্তু প্রকাণ্ড একটা কালো মেঘ ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে 'কপ্টারের নিচে। ঢাকা পড়ে গেছে বহু নিচের বনভূমি।

'কি দেখেছিস?'

কামাল বলল, 'সাদা, লম্বা বিরাট কিছু একটা দেখছি। উঁচু মাটির ঢিবির ওপর রয়েছে। আশপাশটা সমতল, গাছপালাহীন মাঠের মত।'

'প্লেনটাকে দেখিসনি?'

'না। হয়তো আছে—দেখতে পাইনি।'

অপেক্ষা করতে হলো অনেকক্ষণ। প্রকাণ্ড মেঘটা গদাইলস্করী ভঙ্গিতে এগোচ্ছে। মিনিট দশেক পর বিদায় নিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে সবাই দেখতে পেল নিচের বনভূমি।

কেউ কোন কথা বলল না। লম্বা, চুরুটের মতই দেখতে বটে জিনিসটা। তবে ঠিক সাদা নয়, রূপোর মত রঙ। ঝকঝক করছে। উঁচু একটা মাটির পাহাড়ের উপর রয়েছে সেটা। প্লেনটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'প্লেনটা সম্ভবত অন্য কোন পথ দিয়ে ফিরে গেছে,' বলল শহীদ।

ওমেনা জানতে চাইল, 'কুয়াশা, কি ওটা?'

কুয়াশা বলল, 'আরও কাছাকাছি থেকে না দেখলে ঠিক বলা যাচ্ছে না ওটা কয়েক বছর আগে আফ্রিকার জঙ্গলে বা ভূমধ্যসাগরে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া জেপলিন জাতীয় আকাশ যান ব্লু বার্ড কিনা।'

শহীদ বলল, 'কয়েক মাইল দূরে নামতে হবে আমাদেরকে। হাদি হুসেনদেরই আকাশযান ওটা, ধরে নেয়া যায়। নিশ্চয়ই গার্ড আছে আশপাশে। খুব সন্তর্পণে ওটার দিকে এগোতে হবে আমাদের।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক বলেছ। মাইল তিনেক দূরে নামব আমরা। হেঁটে এগোতে

হবে।'

'কন্টার ছুটল আবার।

শহীদ বলল, 'খুবই আশ্চর্য লাগছে একটা কথা ভেবে। ওটা ব্লু-বার্ড হোক বা না হোক, এই ধরনের আকাশযান আজকাল একেবারেই অচল, তাই না? হাদি হুসেনরা আধুনিক কোন আকাশযান ব্যবহার করছে না কেন?'

কুয়াশা বলল, 'নিশ্চয়ই সঙ্গত কোন কারণ আছে। এই ধরনের জেপলিন জাতীয় আকাশযানের কিছু সুবিধে অবশ্যই আছে। ল্যাণ্ডিং স্পেস অর্থাৎ রানওয়ে লাগে না এটাকে নামাতে বা ওড়াতে। অনেক উঁচু দিয়ে উড়তে পারে। কোথাও না নেমে অনেক বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এতগুলো সুবিধে একসঙ্গে আধুনিক কোন আকাশযান দিতে পারছে না। এটার একমাত্র অসুবিধে, এর গতি খুব মন্থর, এই যা।'

শহীদ বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। হাদি হুসেনরা অবৈধ কাজে লিপ্ত। ওদের জন্য এই ধরনের আকাশযানই দরকার। আধুনিক প্লেনগুলো জেটই হোক বা বোয়িংই হোক, প্রচণ্ড শব্দ করে। সেগুলো ব্যবহার করলে মানুষের চোখে পড়বার ভয় আছে ওদের। জেপলিনে শব্দ খুব কম হয়।'

কুয়াশা বলল, 'নিচে ছোট একটা মাঠ দেখা যাচ্ছে, নামছি আমরা ওখানে।'

ডি.কস্টা কামালের উদ্দেশে বলল, 'ডর লাগিতেছে!'

'কেন?'

ডি.কস্টা বলল, 'এনিমিডেরকে টো, আই মিন, এনিমিডের আকাশ যানের সন্ধান টো পাইলাম, কিন্টু হামরা পৌছাইবার আগেই যডি উহারা পলাইয়া যায়?'

কামাল বলল, 'পালিয়ে যাবে কোথায়? ওদেরকে আমরা নরক পর্যন্ত ধাওয়া করব।'

'বাট, হামি টাহাটে রাজি নই। নরক ইজ ভেরি ব্যাড প্লেস!'

ওমেনা ওদের কথা শুনছিল, মৃদু হেসে বলল, 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো না গিয়ে উপায় নেই আপনার। কুয়াশার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে যা পাপ করেছেন তার শাস্তি তো পেতেই হবে আপনাকে। সৃষ্টিকর্তা নরকে আপনাকে একদিনের জন্য হলেও পাঠাবেন।'

'ইমপসিবল! পাপ করিলে কি হইরে, হামি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বাঁচিয়া যাইব···থুড়ি···নো। কে বলিয়াছে হামি পাপ করিয়াছি! জীবনে একটিও মিঠ্যা কঠা বলি নাই, কখনও চুরি করি নাই···' খেপে গেল ডি.কস্টা।

কামাল বলল, 'শান্ত হোন, মি. ডি.কস্টা। অমন উত্তেজিত হতে নেই। সবাই ভাববে নরকে যাবার ভয়ে আপনি দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। আসলে কি জানেন, নরকে আপনি গেলেও দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমরা তো আছি। হাজার হোক, আপনার বন্ধু-বান্ধবই তো আমরা। আপনি নরকে গেলে আমরা কি চুপ করে বসে থাকব? কখনও না। আমরা সবাই ছুটব আপনাকে নরক থেকে উদ্ধার করে আনতে।'

ডি.কস্টা চেয়ে রইল কামালের দিকে। তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'হাপনি সত্যি হামার গুড ফ্রেণ্ড। একটা কঠা বলি, অটীটে সংসার ঢর্ম পালন করিবার জন্য ডু' একটা ক্রাইম করিয়াছি—। হয়টো সেজন্য নরকে যাইটে হইটে পারে। মি.

কামাল, সত্যি হামাকে মুক্ত করিটে যাইবেন হাপনারা? কঠা ডিটেছেন?'

হাসি চেপে কামাল বলল, 'নিশ্চয়ই যাব। কথা দিচ্ছি।'

'যাক, শান্টিটে মরিটে পারিব টাহা হইলে। মনে ভরসা রহিল, নরকে যাইলেও হাপনারা হামাকে মুক্ত করিয়া আনিবেন। একটা কঠা, হামাকে উড্‌চার করিটে হাপনি যডি নরকে একা যাইটে ভয় পান টাহা হইলে হামার বস্‌কে শুড্ডু মনে করাইয়া ডিবেন। টিনি যডি জানিটে পারেন যে হামি নরকে গিয়াছি টাহা হইলে এক সেকেণ্ডও ডেরি না করিয়া টিনি ছুটিয়া গিয়া হামাকে মুক্ত করিয়া আনিবেন—আই অ্যাম ভেরি শিওর অ্যাবাউট দ্যাট! একমাত্র টিনিই পারিবেন নরক হইটে হামাকে মুক্ত করিটে। টবে হাপনারাও যাইবেন সাঠে, কেমন? ভ্রমণ করিয়া আসিতে ক্ষটি কি...'

কামাল বলল, 'কিন্তু যদি স্বয়ং কুয়াশা নরকে যায়?'

'হোয়াট! নো—দ্যাটস ইম্‌পসিবল!'

'বলা তো যায় না,সৃষ্টিকর্তার বিচার কেমন হয়। যদি যায়?'

ডি.কস্টা বলল, 'টাহা হইলে নরক বেশিডিন নরক ঠাকিবে না। মি. কুয়াশা নিজের চেষ্টায় নরককে স্বর্গে পরিণট করিয়া ফেলিবেন। যেমন এই দুনিয়াটাকে টিনি সৎ মানুষের, বুডটিমান মানুষের বসবাসের যোগ্য করিটে চেষ্টা করিটেছেন, টেমনি নরকটাকেও...'

'নামো সবাই!'

কুয়াশা চেঁচিয়ে উঠল।

লাফ দিয়ে নামল শহীদ, রাসেল, ওমেনা। তাদের পিছু পিছু নামল কামাল, ডি.কস্টা।

কুয়াশা ইতিমধ্যেই ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করে হেদায়েত উল্লার অবস্থান জেনে নিয়েছে। সে বলল, 'হেদায়েত এখান থেকে মাইল খানেক দূরে আছে। ওদিকেই চলো।'

যে-যার ব্যাগ কাঁধে তুলে নিয়েছে। প্রায় প্রত্যেকের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। বিপদ কোন্ দিক থেকে হঠাৎ আসে বলা তো যায় না।

শহীদ সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলল, 'সুন্দরবনের সবচেয়ে দুর্গম এলাকা এটা। খুব সাবধান।'

কুয়াশা অস্বস্তি বোধ করছিল একটা কারণে। দ্রুত এগিয়ে যেতে চাইছে সে। উঁচু উঁচু নিশ্ছিদ্র কাঁটাওয়ালা ঝোপ, ঘন সন্নিবেশিত বৃক্ষরাজি অতিক্রম করে যাচ্ছে সে ঠিকই, কিন্তু দলের বাকি সবাই পিছিয়ে পড়ছে। সে জন্যে মাঝে-মধ্যেই থামতে হচ্ছে কুয়াশাকে।

একমাইল অতিক্রম করতেই লেগে গেল প্রায় দেড় ঘণ্টা। নদীর কিনারায় এসে পৌঁছুল ওরা। স্পীডবোটের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। এগিয়ে আসছে এদিকেই। খানিক পরই দেখা গেল সেটাকে।

হেদায়েত উল্লা বলল, 'ভাইয়া কি স্পীডবোটে চড়ে আরও গভীরে যেতে চান?'

কুয়াশা বলল, 'পায়ে হেঁটে আমি একাই যাব। শহীদ, তোমরা সবাই অপেক্ষা করো এখানে। আরও মাইল দুই এগোতে হবে আমাকে। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে ফিরব। যদি না ফিরি, ধরে নেবে আমি বিপদে পড়েছি।'

শহীদ বলল, 'কিন্তু তুমি একা যাবে কেন? আমিও যাই তোমার সঙ্গে।'

কুয়াশা বলল, 'তোমাকে সঙ্গে নিলে ভালই হত। কিন্তু এদের সঙ্গে তোমার থাকা দরকার, শহীদ।'

শহীদ আর কথা বাড়াল না।

কুয়াশা আর বৃথা কালক্ষেপ না করে দ্রুত পা বাড়াল। দেখতে দেখতে গহীন বনভূমি তাকে গ্রাস করল।

এগিয়ে যেতে খুবই অসুবিধে হচ্ছিল কুয়াশার। জঙ্গল এদিকে এমনই গভীর যে সামনে দেখা যায় না, কয়েক হাত দূরের জিনিসও গাছের ডাল, শাখা প্রশাখা, অসংখ্য মোটা মোটা প্যাঁচানো ঝুরি, এবং ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা পড়ে আছে। কিন্তু অসুবিধে হলেও এর চেয়ে গভীর বনভূমির উপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যাবার অভিজ্ঞতা আছে কুয়াশার।

দ্রুত এগিয়ে চলেছে সে। কখনও লাফ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে সে ঝোপ-ঝাড়, কখনও ঝুরি ধরে ঝুলতে ঝুলতে অতিক্রম করছে দূরত্ব, কখনও গাছের শাখার উপর চড়ে অন্য গাছের শাখায় লাফিয়ে পড়ে এগিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে মাইল দেড়েক এগোবার পর থামল কুয়াশা।

বাতাসে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছে সে। উঁচু একটা গাছের নিচে গিয়ে দাঁড়াল নিঃশব্দে। কাঠবিড়ালির মত উঠতে শুরু করল গাছটার কাণ্ড বেয়ে।

গাছের মগডালে উঠে এদিক ওদিক তাকাতেই লোকটাকে দেখতে পেল কুয়াশা। লোকটার গায়ের রঙ আলকাতরার মত কালো, চকচকে। সিগারেট খাচ্ছে একটা গাছের মোটা ডালে বসে। লোকটা আফ্রিকান নিগ্রো। তার এক হাতে রয়েছে একটা রাইফেল।

লোকটাকে দেখে খুশিই হলো কুয়াশা। হাদি হুসেন এই গভীর জঙ্গলেও প্রহরী মোতায়েন রেখেছে। হাদি হুসেনরা এখুনি আফ্রিকার উদ্দেশে যাত্রা করছে না বুঝতে পারা গেল। যাত্রার আগে প্রহরীরা আকাশযানের কাছে ফিরে যাবে। এটাই কুয়াশার খুশির কারণ।

গাছের মগডাল থেকে আরও কয়েকজন প্রহরীকে দেখল কুয়াশা। চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূরে দূরে একজন করে প্রহরী। হাদি হুসেনদের লোক সংখ্যা কম নয় দেখা যাচ্ছে।

গাছ থেকে নেমে সন্তর্পণে এগোতে শুরু করল কুয়াশা। খুব সাবধানে এগোচ্ছে সে। খানিক পরই দেখা গেল নিচের ভূমি ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠে গেছে উপর দিকে। ভাগ্য ভাল যে পাহাড়টা খাড়া নয়। ঢালু ভূমিতে গাছপালা, ঝোপ-ঝাড় যেন অধিকতর ঘন সন্নিবেশিত। পাতার উপর দিয়ে হাঁটছে কিন্তু যাতে এতটুকু শব্দ না হয় তার দিকে মনোযোগ প্রখর। প্রায় নিঃশব্দে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে কখনও ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে অল্প অল্প করে এগোতে হচ্ছে। দুই গজ জায়গা অতিক্রম করতে কখনও লেগে যাচ্ছে চার পাঁচ মিনিট সময়।

অগ্রগতি মন্থর হয় হোক, কিন্তু কোন শব্দ করা চলবে না।

অবশেষে বনভূমির এমন এক জায়গায় পৌঁছুল কুয়াশা যেখান থেকে বিশাল একটা গাছপালাহীন, ফাঁকা জায়গা দেখতে পাওয়া যায়। ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করল সে।

সমতল জায়গার প্রায় মাঝখানে প্রকাণ্ড আকাশযানটাকে দেখা যাচ্ছে। প্রকাণ্ড একটা গাছের শুকনো কাণ্ডের সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে আকাশযানের সামনেটা। পিছন দিকটাও তেমনি বাঁধা রয়েছে একটা লোহার ভারি নোঙরের সঙ্গে।

কুয়াশা লক্ষ করল চুরুটের মত লম্বা আকাশযানটার পিছন দিকে একটা গরাদহীন জানালা দেখা যাচ্ছে। জানালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে লোহার মোটা শিকল। সেই শিকল জড়ানো রয়েছে নিচের নোঙরের সঙ্গে।

লম্বা আকৃতির প্রকাণ্ড আকাশযানটা ভাসছে শূন্যে।

কন্ট্রোল-কেবিনের জানালা দেখা যাচ্ছে। কে একজন বসে রয়েছে ভিতরে। একটি মেয়েই হবে। কিন্তু তার মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আকাশযানটার গায়ে বড় বড় অক্ষরে আবছা লেখা, BLUE-BIRD—YX03.

কয়েক বছর আগে হারিয়ে যাওয়া জেপলিন ব্লু-বার্ড তাহলে এটাই! ব্লু-বার্ড তাহলে ভূমধ্যসাগরে ডোবেনি বা আফ্রিকার জঙ্গলে ধ্বংস হয়েও যায়নি।

কন্ট্রোল-কেবিনের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতেই মেয়েটিকে চিনতে পারল কুয়াশা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে শায়লা পারভিন। পায়চারি করছে সে অস্থিরভাবে। কুয়াশা দেখল শায়লা পারভিনের দুই হাত সরু লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে।

হাদি হুসেন বা উত্তালকে কোথাও দেখতে পেল না কুয়াশা।

ব্লু-বার্ডের পেটের কাছে একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ি লাগানো রয়েছে দরজার সঙ্গে। আফ্রিকান লোকেরা মালপত্তর ওঠাচ্ছে উপরে। বোঝা যাচ্ছে, যাত্রার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে এরা।

পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা চলছে কুয়াশার মাথার ভিতর। পনেরো বিশ-মিনিট কেটে গেল। এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল হাদি হুসেন আর উত্তাল।

ওদেরকে দেখেই আশপাশের কর্মীরা ব্যস্ত হয়ে নিজের নিজের কাজে উঠে পড়ে লাগল। যমের মত ভয় করে সবাই ওদেরকে, বুঝতে অসুবিধে হলো না কুয়াশার।

ভুরু কুঁচকে উঠল কুয়াশার। ব্যাপার কি! হাদি হুসেন আর উত্তাল সোজাসুজি তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

ওদের দু'জনের হাতেই রিভলভার। হাবভাব দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না ওরা কুয়াশার অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে। শান্তভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে তারা।

কাছাকাছি এসে একটু ডান দিকে সরে গেল। ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় এসে দাঁড়াল। মাত্র আট-দশ হাত দূরত্ব কুয়াশার কাছ থেকে।

বনভূমির ভিতর থেকে একজন আফ্রিকান লাফ দিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় উঠে

গেল, দাঁড়াল হাদি হুসেন আর উত্তালের মুখোমুখি।

একটু অবাকই হলো কুয়াশা। তার কাছ থেকে মাত্র আট-দশ হাত দূরে একজন প্রহরী রয়েছে বনভূমির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে, তা সে টেরই পায়নি।

হাদি হুসেন নিচু স্বরে কিছু বলল লোকটাকে। লোকটা ঘাড় কাত করে সায় দিল বলে মনে হলো। তারপর আবার সে বনভূমির ভিতর প্রবেশ করল।

হাদি হুসেন আর উত্তাল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সিগারেট বের করে ধরাল উত্তাল। ব্লু-বার্ডের দিকে মুখ করে দাঁড়াল, বলল, 'ওই মেয়েলোকটা! ওকে দেখলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কেন যে ওর জন্যে তুমি এমন পাগল হয়ে উঠেছ তা বুঝি না। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় নাকি! ও আর কি সুন্দরী, ওর চেয়ে হাজার গুণ সুন্দরী মেয়ে পেতে পারো তুমি!'

'চুপ করো।'

গম্ভীর হয়ে উঠেছে হাদি হুসেন। প্রকাণ্ড, মেদবহুল, ভারি দেহটা নড়ে উঠল তার, আবার ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, 'ওকে আমার ভাল লাগে, উত্তাল। কথাটা হাজার বার তোমাকে বলেছি।'

উত্তাল বলল, 'যে পোষ মানবে না তাকে নিয়ে কেন খামোকা এত এনার্জি ক্ষয় করছ? আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি—ওকে খতম করে ফেলো। আমার কথা শোনোনি বলেই এই বিপদে পড়তে হয়েছে আমাদেরকে। তোমার ওই ডাইনী মেয়েলোকটাই সব সর্বনাশের মূল। সেই আফ্রিকা থেকে এই এত দূরে ছুটে আসতে হয়েছে আমাদেরকে ওরই জন্যে। তবু তোমার চোখ খুলছে না। সুযোগ রয়েছে, ইচ্ছা করলেই ওকে খুন করে ফেলতে পারো। তা করবে না। বেশ, এ ব্যাপারে আমি আর কিছু বলতে চাই না। কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, ওই ডাইনীর জন্যে আবার আমরা বিপদে পড়ব।'

হাদি হুসেন বলল, 'থামো তুমি। আমাকে বোঝাতে এসো না। শখের জিনিসের প্রতি আমার দুর্বলতার কথা আমি স্বীকার করছি। ওকে আমার ভাল লেগেছে, ওকে আমি বিয়ে করব। আবার ওকে আমাদের আস্তানায় নিয়ে গেলে ওর মন বদলাবে। বাধ্য হয়ে হলেও আমাকে বিয়ে করবে ও। এখন ভালয় ভালয় এই দেশ ত্যাগ করে আফ্রিকায় পৌঁছুতে চাই আমি।'

'কখন রওনা হব আমরা?'

'আজই। আজ রাতেই।'

ব্লু-বার্ডের দিকে পা বাড়াল দু'জন।

যা জানবার জেনেছে কুয়াশা। শায়লা পারভিন ওদের কাছে আপাতত নিরাপদেই থাকবে জানতে পেরে স্বস্তি বোধ করল সে।

নিঃশব্দে ঢালু বনভূমি থেকে নামতে শুরু করল কুয়াশা। ফিরে যেতে হবে তাকে স্পীডবোটে। সবাইকে নিয়ে আবার আসতে হবে। মনে মনে একটা পরিকল্পনা তৈরি করেছে সে। পরিকল্পনাটা বাস্তবায়িত করতে যাওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু তা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই এখন।

দুই

মাত্র দেড় ঘণ্টা পর ফিরে এল কুয়াশা।

বলল, 'হেদায়েত, তোমার লোকদের তুমি বোট নিয়ে ফিরে যেতে বলো ক্যাম্পে। তুমি শুধু একজনকে নিয়ে চলে যাও আমাদের 'কপ্টারের কাছে। ওখানে তুমি অপেক্ষা করবে। আজ রাতে শত্রুরা ব্লু-বার্ড নিয়ে যাত্রা শুরু করবে। আমরা ব্লু-বার্ডে চড়ব, ভিতরে লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করব। যদি সফল হই তাহলে তো কথাই নেই, তুমি 'কপ্টার নিয়ে ফিরে যাবে খুলনায়। আর যদি ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হয় তাহলে 'কপ্টার নিয়ে যতদূর সম্ভব ওদেরকে ধাওয়া করব। তুমি 'কপ্টার নিয়ে সারাটা রাত এখানেই থাকবে। সকাল নাগাদ যদি আমরা না ফিরি তাহলে ধরে নেবে ব্লু-বার্ডে চড়তে পেরেছি আমরা—তখন তুমি ফিরে যাবে।'

'ঠিক আছে, ভাইয়া।'

কালবিলম্ব না করে রওনা হলো ওরা সবাই কুয়াশার নেতৃত্বে। যেতে যেতে কুয়াশা যা যা দেখেছে সব বলল ওদেরকে।

সব শেষে সে বলল, 'ওদের চোখ ফাঁকি দিয়ে ব্লু-বার্ডের কাছাকাছি পৌঁছুনোটাই বড় কথা। উপরে ওঠা খুব একটা কঠিন হবে না। আমি লক্ষ করেছি ব্লু-বার্ডের ঠিক পিছনে একজন প্রহরী আছে। আধঘণ্টার মধ্যে দু'বার তাকে সিগারেট খাবার জন্যে জঙ্গলের ভিতর ঢুকতে দেখেছি আমি। ব্লু-বার্ড হাইড্রোজেন গ্যাসের একটা ট্যাঙ্ক বিশেষ, তাই কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া নিষেধ। লোকটার সিগারেটের প্রতি এই যে অত্যধিক আসক্তি—এটাই আমাদের সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে।'

'দলে কত লোক ওদের?'

'পনেরো বিশ জনকে দেখেছি। আরও বেশি থাকতে পারে। চেহারা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় সব ক'টা অপরাধী, গুণ্ডা-বদমাশ। শক্ত-সমর্থ শরীর, ক্ষতবিক্ষত মুখ, বেপরোয়া অঙ্গভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি নির্মম। সবাই সশস্ত্র। দু'একজন ইউরোপিয়ানকেও দেখেছি। বাঙালী বলতে একমাত্র উত্তাল চৌধুরী। বাকি সবাই আফ্রিকান।'

এবারের এগিয়ে যাবার গতি ধীর, মন্থর। কুয়াশার মত দ্রুত এগিয়ে যেতে পারছে না কেউ। ফলে কুয়াশাকেও ধীরে ধীরে এগোতে হচ্ছে। তবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এগোচ্ছে সবাই।

ঘণ্টাখানেক পর কুয়াশা চাপা স্বরে বলল, 'আর কোন কথা নয়। কোন শব্দ নয়। আশপাশেই রয়েছে প্রহরীরা।'

একটা গাছে চড়ল কুয়াশা। চারদিক দেখে নেমে এল সে। দিক পরিবর্তন করল দলটা। একটু একটু করে, প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলল সবাই কুয়াশার পিছু পিছু।

খানিকপর ক্রমশ উঁচু ভূমির দেখা মিলল। আরও সতর্ক, আরও সাবধান হলো

সবাই। পরিশ্রমে ক্লান্ত ওরা। কিন্তু কেউ জোরে নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না।

একশো গজ চড়াই অতিক্রম করতে প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল ওদের। তারপর সামনে দেখা গেল ফাঁকা জায়গাটা।

কুয়াশা বলল, 'সবাই গা ঢাকা দিয়ে থাকো। কোন শব্দ নয়—সাবধান! রাত না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদেরকে।'

অপেক্ষার পালা শুরু হলো। বিরক্তিকর, একঘেয়ে ভাবে কাটছে সময়। সবাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে সামনের সবকিছু। ব্লু-বার্ডটা সত্যি আশ্চর্য এক জিনিস। পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে মোড়া সেটা। দশটা বড় বড় গোলাকার গম্বুজ রয়েছে উপরে, পাশাপাশি। ওগুলোর কোনটা ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক, কোনটা হাইড্রোজেন গ্যাস-ট্যাঙ্ক।

কুয়াশা ফিসফিস করে বলল, 'ব্লু-বার্ডের পাঁচটা ইঞ্জিন, সবক'টা নিচে, পাশাপাশি। ফুয়েল ট্যাঙ্কগুলো উপরের দিকে।'

আফ্রিকান প্রহরীরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সবাই লক্ষ করল ব্লু-বার্ডের পিছনে মোতায়েন প্রহরীটা ক'মিনিট পরপরই ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকছে সিগারেট খাবার জন্যে। মিনিট চার-পাঁচ পর আবার ফিরে আসছে সে লোহার শিকলের কাছে।

সূর্য অস্ত গেল একসময়। হঠাৎ করেই সন্ধ্যা নেমে এল চারদিকে।

'গাঢ় হোক অন্ধকার, তারপর,' বলল কুয়াশা। কেউ কথা বলল না। উত্তেজনা বোধ করছে সবাই এতক্ষণে। সকলেই ভাবছে, এতগুলো লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ব্লু-বার্ডে ওঠা কি সম্ভব হবে? ওঠা সম্ভব হলেও লুকিয়ে থাকা সম্ভব কতক্ষণ? ধরা পড়লে কি হবে···?

কিন্তু ধরা পড়বার ভয়ে ভীত নয় ওরা কেউ। সে-কথা ভেবে কাউকে দুশ্চিন্তা করতে দেখা গেল না। সকলেই ভাবছে কিভাবে শত্রুদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ব্লু-বার্ডে ওঠা যায়।

'বেতের ঝুড়িটা কিন্তু দেখিনি আমি।' কুয়াশা বলল।

কামাল জানতে চাইল, 'কোন বেতের ঝুড়ির কথা বলছ? যেটায় রক্তচোষা বাদুড়টা রাখে ওরা?'

'হ্যাঁ।'

শহীদ বলল, 'সেটা ব্লু-বার্ডের কোথাও আছে নিশ্চয়।'

ডি.কস্টা জানতে চাইল, 'কোঠায় যাইটে চাহি হামরা? আফ্রিকায়?'

'অবশ্যই,' বলল কামাল।

'হেটু?'

কামাল বলল, 'হেতু? শায়লা পারভিনের মুখ থেকে একদল দুর্ভাগা লোকের কথা শুনেছি আমরা। লোকগুলোকে সম্ভবত আফ্রিকার কোন দুর্গম জায়গায় বন্দি করে ক্রীতদাসের মত আটকে রাখা হয়েছে। তাদেরকে মুক্ত করাই আমাদের এই অভিযানের উদ্দেশ্য।'

ডি.কস্টা বলল, 'ভেরি গুড।'

ঘন অন্ধকার ঢেকে ফেলল চারদিক। আফ্রিকান প্রহরীরা টর্চ হাতে নিয়ে ঘুরে

বেড়াচ্ছে। ব্লু-বার্ডের পেটের কাছে জ্বলছে একটা বৈদ্যুতিক আলো।

এমন সময় বৃষ্টি এল তুমুলবেগে। সেই সঙ্গে জোর বাতাস।

মিনিট পনেরো একনাগাড়ে বৃষ্টি হবার পর মেঘ কেটে গেল।

ভিজে গেছে ওরা সবাই। কিন্তু কেউ নড়েনি নিজের জায়গা ছেড়ে, কেউ কোন শব্দ করেনি।

'ওই যে, লোকটা আবার সিগারেট খেতে যাচ্ছে। এই সুযোগে আমরাও এগোব।'

কুয়াশা পা বাড়াল। জঙ্গল থেকে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল সে। ফিসফিস করে বলল, 'হামাগুড়ি দিয়ে এসো সবাই।'

কুয়াশা নিজেও শুয়ে পড়ল সমতল ভূমিতে। বুকে হেঁটে দ্রুত এগোতে লাগল সে তির্যকভাবে, ব্লু-বার্ডের পিছনের লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা নোঙরটার দিকে।

আফ্রিকান ভাষায় প্রহরীরা হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে উঠছে। পরস্পরের উপস্থিতি, অবস্থান সম্পর্কে খবরাখবর নিচ্ছে তারা।

বিরতি না নিয়ে এগিয়ে চলল ওরা ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে। গোটা দলটা প্রায় একসঙ্গে পৌঁছে গেল ব্লু-বার্ডের পিছনে।

লোহার মোটা শিকল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠতে শুরু করল কুয়াশা। গরাদহীন জানালার কাছে পৌঁছে মাথা তুলে উঁকি দিল সে। কেউ নেই কামরার ভিতর। জানালা গলে ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

কামরাটা বেশ বড়সড়। কোন দরজা দেখল না কুয়াশা। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। সেই আলোয় দেখল সে কামরার মুখোমুখি সরু সরু প্যাসেজের মত অনেকগুলো টানেল দেখা যাচ্ছে। মোটা পাইপের টানেল। পাইপগুলো ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে এই কামরার দিকে, প্রবেশ করেছে কামরার দেয়ালের পাশে রাখা বড় বড় টিনের পাত্রে। পাইপের মুখগুলোয় ফিল্টার লাগানো। টিনের প্রকাণ্ডাকার পাত্রগুলোয় পানি জমে রয়েছে। টিনের পাত্রগুলোর নিচে ছোট ছোট ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র পথে পানি পড়ছে নিচে, মাটিতে।

পাইপের টানেলগুলো ক্রমশ উঁচুতে উঠে গেছে। সোজা তাকালে দেখা যাচ্ছে একটা সিঁড়ি। সিঁড়ির দু'পাশে অসংখ্য মোটা মোটা পাইপ। সিঁড়ির মাথা থেকে শুরু হয়েছে করিডর। লম্বা করিডর। করিডরের দু'পাশে কেবিন। শেষ মাথায় কন্ট্রোল রুম। করিডরের উপর হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি ট্যাঙ্ক। টানেলের মোটা পাইপগুলো গিয়ে মিশেছে সেই ট্যাঙ্কগুলোয়।

পাইপগুলো মোটা হলেও পাতলা অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে তৈরি।

নেমে এল কুয়াশা। বলল, 'একে একে উঠে পড়ো সবাই।'

বলতে যা দেরি, ডি.কস্টা শিকল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠতে শুরু করল, তাকে অনুসরণ করল কামাল।

কুয়াশা দল ছাড়া হয়ে সরে গেল একটু দূরে। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, সতর্ক দৃষ্টি রাখছে প্রহরীদের দিকে।

দূরে, জঙ্গলের কিনারায়, ছোট্ট একটা আগুনের টুকরো দেখা যাচ্ছে। প্রহরীটা সিগারেট খাচ্ছে। মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে সেটা।

দ্রুত তাকাল কুয়াশা শিকলের দিকে। উঠে যাচ্ছে শহীদ। আবার তাকাল সে জঙ্গলের দিকে। ছোট্ট আগুনের টুকরোটা ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ল। বোঝা গেল, প্রহরী তার সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে—এবার সে এগিয়ে আসছে।

অন্ধকারে দুই লাফে শিকলটার কাছে চলে এল কুয়াশা। দুই হাত ধরে ঝুলে পড়ল সে শিকল ধরে, উঠতে শুরু করল দ্রুত।

'এই! কে? কে ওখানে?'

আফ্রিকান ভাষায় প্রহরীটা চিৎকার করে উঠল।

সর্বনাশ! প্রমাদ গুণল কুয়াশা। ধরা পড়ে গেছে সে।

'থামো! যেই হও, নোড়ো না বলছি!'

কুয়াশা আরবী ভাষায় ভারি গলায় বলে উঠল, 'চুপ্ করো, গাধা কোথাকার! কাজের সময় গোলমাল করতে পারো শুধু তোমরা। কানা নাকি? দেখতে পাচ্ছ না শিকলটা পরীক্ষা করছি আমি।'

'ও, ঠিক আছে, ঠিক আছে। অন্ধকার কিনা, বুঝতে পারিনি।'

কুয়াশা হাঁফ ছেড়ে আবার উঠতে শুরু করল।

এমন সময় গরাদহীন জানালায় একটা হাত দেখা গেল। ঘড়িটা দেখে হাতটা চিনতে পারল কুয়াশা। শহীদের হাত।

শহীদের হাতের আঙুলগুলো নড়ছে। একমুহূর্ত পরই হাতটা সরিয়ে নিল ও।

চমকে উঠল কুয়াশা। আঙুল নেড়ে সঙ্কেতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে শহীদ, আমরা ধরা পড়ে গেছি।

গতি এতটুকু শ্লথ হলো না কুয়াশার। মুহূর্তের জন্য একটা হাত তার আলখেল্লার পকেটে ঢুকল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল সেটা।

পরমুহূর্তে সেই হাত দিয়ে জানালার কারনিস ধরল সে, মাথা তুলল জানালা বরাবর। ঠঙ্ করে মৃদু শব্দ হলো একটা।

একটা রিভলবারের নল দেখতে পেল কুয়াশা। তার মাথার দিকে লক্ষ্য করে ধরা রয়েছে।

'উঠে এসো, বাছাধন!'

মাথার উপর থেকে আফ্রিকান লোকটা কর্কশ কণ্ঠে, চিবিয়ে চিবিয়ে হুকুম করল। কুয়াশা দেখল কামরার ভিতর রিভলভারধারী আরও একজন লোক রয়েছে।

শহীদ, কামাল, ওমেনা, রাসেল এবং ডি.কস্টা দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। তাঁদের সকলের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে রিভলভার উঁচিয়ে দ্বিতীয় নিগ্রোটা।

শিকল ধরে উঠে পড়ল কুয়াশা জানালার উপর। লাফ দিয়ে নামল কামরার মেঝেতে।

'মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও!' নির্দেশ দিল সামনের নিগ্রোটা।

মাথার উপর হাত তুলল কুয়াশা। নিজের বুকের দিকে তাকাল সে। তারপর তাকাল শহীদ, কামাল, ওমেনা—ওদের প্রত্যেকের দিকে একবার করে। তারপর আবার নিজের বুকের দিকে তাকাল।

কুয়াশার ইঙ্গিত বুঝতে অসুবিধে হলো না কারও। সবাই লম্বা শ্বাস নিয়ে দম বন্ধ করে রাখল।

'কি ব্যাপার শুনি···?'

প্রথম নিগ্রোটা কথা শেষ করতে পারল না, টলে উঠল সে। চোখের পলকে পড়ে গেল সে মেঝের উপর সশব্দে। চিৎকার করার জন্য মুখ হাঁ করল দ্বিতীয় নিগ্রোটা, কিন্তু হঠাৎ সে-ও টলে উঠল, জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল প্রথম জনের মতই সশব্দে।

বলাই বাহুল্য, জানালার সামনে পৌঁছেই কুয়াশা একটা ক্ষুদ্রাকার গ্যাস বোমা ছেড়ে দিয়েছিল হাতের মুঠো থেকে কামরার মেঝেতে। সেই গ্যাসেই আক্রান্ত হয়েছে নিগ্রো দু'জন।

মিনিট খানেক পর দম ছাড়ল ওরা সবাই।

'দেহ দুটোকে নিয়ে সমস্যা হবে।' গম্ভীর শোনাল ওমেনার কণ্ঠস্বর, 'ওদেরকে না পেলে সন্দেহ সৃষ্টি হবে শত্রুদের মনে, তন্ন তন্ন করে খুঁজবে ওরা। ধরা পড়তে আমরা বাধ্য।'

কামাল জানতে চাইল, 'মি. ডি.কস্টা, কি করছেন শুনি?'

নিজের ব্যাগ খুলে ডি.কস্টা একটা সিরিঞ্জ আর একটা ওষুধের শিশি বের করেছে। জিনিস দুটো নিয়ে বসেছে সে অচেতন লোক দুটোর পাশে। শিশি থেকে সিরিঞ্জে পরিমিত ওষুধ নিয়ে একজন নিগ্রোর বাহুতে ইঞ্জেকশন দিতে যাচ্ছে সে।

শহীদ বলল, 'বাধা দিসনে ওকে। ব্রেন-প্যারালাইজার মেডিসিন ঢুকিয়ে দিচ্ছে ও নিগ্রোদের শরীরে। জ্ঞান ফিরলেও ওরা অতীতের কোন কথা স্মরণ করতে পারবে না। নেশাগ্রস্ত মানুষের মত আচরণ করবে। বেশ কয়েকদিন থাকবে ওষুধটার প্রভাব।'

ওমেনা বলল, 'আমি তাহলে ডি.কস্টাকে সাহায্য করি।'

বলেই সে তার ব্যাগ খুলে বড় একটা হুইস্কির বোতল বের করল। ছিপি খুলে নিগ্রো দু'জনের জামা-কাপড়ে, চোখে মুখে হুইস্কি ছিটিয়ে দিল সে খানিকটা করে। বলল, 'হাদি হুসেন গন্ধ শুঁকেই বুঝতে পারবে এরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে।'

এমন সময় বিদ্যুৎবেগে লাফ দিল কুয়াশা। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। একমুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তারপর তার লম্বা, বলিষ্ঠ হাতটা জানালার নিচে নামিয়ে দিয়ে কিছু যেন খপ্ করে ধরে ফেলল সে। দ্বিতীয় হাতটাও নামিয়ে দিল সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল কুয়াশা দুই হাত দিয়ে টেনে আনছে একজন নিগ্রোকে।

কামরার মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দিল কুয়াশা লোকটাকে। লোকটার হাতের রাইফেলটা আগেই কুয়াশা কেড়ে নিয়েছে। ভয়ে, আতঙ্কে, অবিশ্বাসে হাঁ করে দেখছে লোকটা ওদেরকে। কুয়াশা হাত তুলে লোকটার নাকে একটা ঘুসি মারল।

পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে ছিল শহীদ, ধরে ফেলল সে অজ্ঞান দেহটাকে।

'কুইক, মি. ডি.কস্টা!'

জানালার উপর উঠে দাঁড়াল কুয়াশা কথাটা বলেই।

শহীদ এবং কামাল এক নম্বর নিগ্রোর অচেতন দেহটা ধরাধরি করে জানালার কাছে নিয়ে এল।

জানালার উপর বসে পড়ল কুয়াশা। এক হাত দিয়ে শিকলটা ধরে আছে সে।

কামাল এবং শহীদ কুয়াশার কাঁধে চাপিয়ে দিল অজ্ঞান দেহটা। কুয়াশা শিকল বেয়ে সড় সড় করে নেমে গেল নিচে।

এই ভাবে তিনটে দেহই নামিয়ে দিয়ে ফিরে এল কুয়াশা।

কামরার আলো নিভিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। অজ্ঞান দেহগুলো খানিক আগে বা পরে আবিষ্কৃত হবেই। আবিষ্কৃত হবার পর শত্রুদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয় না হয় সেটাই জানতে চায় ওরা। সব কিছু নির্ভর করছে এর উপর।

মিনিট পনেরো পর নিচ থেকে শোরগোলের শব্দ ভেসে এল। কামাল এবং রাসেল জানালার দিকে পা বাড়াল, কুয়াশা দুই হাত দিয়ে ধরে পিছনে সরিয়ে দিল দু'জনকেই। নিজে সাবধানে জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু উঁকি দিয়ে না তাকিয়ে নিচ থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো শোনার চেষ্টা করল সে মন দিয়ে।

বেশ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে হাদি হুসেনের কণ্ঠস্বর।

'গাধার বাচ্চারা কি কাণ্ড করেছে দেখো। ব্যাটারা চুরি করে মদ খেয়ে উচিত শাস্তি ভোগ করছে। আল্লা মালুম, জ্ঞান ফেরে কিনা! এই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিস কেন ব্যাটারা! তোল, দেহগুলো তুলে নে। যাত্রা করার সময় হয়ে এসেছে সেদিকে বুঝি খেয়াল নেই…'

তিন

পাইপ টানেলের শেষ প্রান্তে সিঁড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানটা বেশ প্রশস্ত।

কুয়াশার পিছু পিছু সবাই সেই প্রশস্ত জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। সিঁড়ির পাশ দিয়ে চলে গেছে সরু একটা প্যাসেজ। ইন্সপেকশন টানেল ওটা।

প্যাসেজ বা টানেলের দেয়ালগুলো মসৃণ লিনেন দিয়ে মোড়া। গ্যাস ব্যাগ পাশাপাশি বসানো রয়েছে, লিনেন দিয়ে ঢাকা।

টানেলের শেষ মাথায় পৌঁছে বাঁক নিল ওরা। তির্যকভাবে উঠে গেছে টানেলের মেঝে উপর দিকে। কয়েক মুহূর্ত পর সেলুলয়েডের পর্দা দিয়ে আড়াল করা অবজারভেশন পোর্টের সামনে উপস্থিত হলো ওরা।

পর্দা সরিয়ে উঁকি দিল কুয়াশা। নোঙর তুলে ফেলা হয়েছে দেখল সে। নিচে অন্ধকার, টর্চের আলোও নেই কোথাও। তারমানে সবাই উঠে পড়েছে ব্লু-বার্ডে। যাত্রা শুরু হতে দেরি নেই আর।

'আমরা জাহাজের পিছনের দিকেই থাকব। যাতে প্রয়োজন দেখা দিলে সহজে কন্ট্রোলরুমটা দখল করতে পারি।'

শহীদ বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ করেছ, কুয়াশা? প্রতিটি প্যাসেজের সিলিংয়ের গায়ে গর্ত রয়েছে। কেউ উঁকি দিলেই দেখতে পাবে নিচে কি হচ্ছে না

হচ্ছে।'

কুয়াশা বলল, 'দেখেছি।'

একটা ইন্সপেকশন টানেলে আশ্রয় নিল ওরা। মোটর গনডোলা এবং পাইপ টানেল থেকে জায়গাটা একটু দূরে, কারও চোখে পড়বার সম্ভাবনা কম।

ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ওয়াটার ব্যালাস্ট রয়েছে ব্লু-বার্ডে। সগর্জনে পাইপ বেয়ে পানি পড়ছে নিচে, হালকা করা হচ্ছে আকাশযানটাকে।

খানিক পরই ব্লু-বার্ডের পিছন দিকটা উঁচু হয়ে উঠল। তারপর স্টার্ট নিল ইঞ্জিনগুলো। একে একে চালু হয়ে গেল পাঁচটা ইঞ্জিন।

ধীরে ধীরে উপরে উঠতে শুরু করল। ক্রমশ বেগ বাড়ছে তার। একটানা এক হাজার ফুট উপরে উঠে গেল সে, তারপর আরও এক হাজার ফুট।

বাতাসের চাপ কমে যাওয়াতে গ্যাস-ব্যাগগুলো ফুলে উঠল। মৃদু, থরথর করে কাঁপছে দেয়াল, মেঝে, সিলিং।

একটা পোর্টহোলের পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল কুয়াশা। মেঘ-মুক্ত নির্মল আকাশ। তারাগুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কুয়াশা। বলল, 'পশ্চিম দিকে যাচ্ছি আমরা।'

রাত গভীর হলো।

ঘুমিয়ে পড়ল ওরা। কেবল একজন রইল জেগে। পালা করে জেগে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। বিপদ যখন-তখন আসতে পারে, তাই।

এগিয়ে আসছে বিপদ। কুয়াশা এবং তার দলের সবাই অনুভব করছে ব্যাপারটা। আর বড় জোর দু'এক ঘণ্টা, তারপরই ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটবে। ঘটবেই।

বিপদ ঘটবে জেনেও করার কিছু নেই। গম্ভীর, চিন্তিত সবাই। অপেক্ষা করে আছে ধৈর্যের সঙ্গে।

দুইদিন অতিবাহিত হয়েছে। আজ নিয়ে তিনদিন কাটছে। উপমহাদেশের উপর দিয়ে অনুকূল বাতাস পেয়ে সাবলীল গতিতে প্রচুর দূরত্ব অতিক্রম করেছে ব্লু-বার্ড। ঝড়-ঝাপটার মুখোমুখি হয়নি একবারও। ইঞ্জিনগুলো কাজ করছে চমৎকারভাবে।

আফ্রিকায় প্রবেশ করেছে ওরা ঘণ্টা কয়েক আগে। আফ্রিকার অভ্যন্তরে এখন ওরা। ঘণ্টা দুয়েক ধরে নিচে তাকালেই মরুভূমি দেখা যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়েছে অনেক। নিচের দিকে তাকালেই চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। প্রখর রৌদ্রে মরুভূমির বালি যেন জ্বলছে আগুনের মত।

দীর্ঘ যাত্রাপথ—ব্লু-বার্ড তার ওজন কমিয়ে ফেলেছে প্রয়োজন অনুসারে। পানির ট্যাঙ্কগুলো এখন প্রায় শূন্য। বিশেষ করে পিছনের ট্যাঙ্কগুলোয় পানি একেবারেই নেই। কিন্তু, তা সত্ত্বেও পিছনের দিকটা অস্বাভাবিক ভারি রয়ে গেছে। কারণ, কুয়াশা এবং তার দলবল রয়েছে পিছনে।

হাদি হুসেন এবং উত্তালের চোখ এড়ায়নি রহস্যটা। পিছনের ওজন কমছে না কেন? ভাবছে তারা। কি আছে পিছন দিকে।

অনুসন্ধানকারীরা ঘুরঘুর করছে কিছুক্ষণ থেকে। বারবার তার শব্দ ভেসে আসছে। কাছাকাছি আসছে কেউ কেউ, কাউকে না দেখে, কিছু না দেখে ফিরে

যাচ্ছে তারা। ওদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছে সম্মুখভাগের কোন একটা গ্যাস-বেলুন লিক হয়ে গেছে হয়তো···।

পাইপ-টানেল থেকে ঘুরে এল কামাল।

বলল, 'আরও কয়েকজন লোক আবার এদিকে আসছে। প্রতিটি প্যাসেজ, টানেল পরীক্ষা করতে করতে আসছে ওরা। শেষ রক্ষা বুঝি আর হলো না।'

ডি.কস্টা দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল। বলল, 'টবু ভাল। এই টিন ডিন চুপচাপ শুইয়া-বসিয়া হাটে-পায়ে মরিচা ঢরিয়া গিয়াছে—স্টার্ট হউক ফাইট! এনিমিরা আক্রমণ না করিলে হামরাই আগাইয়া গিয়া অ্যাটাক করিব—টাই না? কারণ, হামাডের খাবার নাই, ওয়াটার নাই···।'

কথাটা সত্যি। ঘণ্টা দুয়েক আগে খাবার পানির শেষ ফোঁটাটাও গলায় ঢালা হয়ে গেছে। শুকনো খাবার এখনও কিছু আছে বটে কিন্তু তা স্বাদহীন, অরুচিকর ঠেকছে ওদের মুখে।

শহীদ বলল, 'একটা কথা সবাই মনে রেখো। প্যাসেজ, ইন্সপেকশন টানেল বা করিডরে কেউ যেন গুলি না করে। গুলি করা কোনমতেই চলবে না। পাইপের দিক থেকে বেরিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস সব জায়গা প্রায় ভিজিয়ে রেখেছে। আগুনের একটা ফুলকিই যথেষ্ট চোখের পলকে গোটা ব্লু-বার্ডকে ধ্বংস করে দিতে।'

কুয়াশা বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো সবাই। শত্রুদেরকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব বলে আমি মনে করি না। প্যাসেজ, বা টানেলগুলো খুবই সরু—ওরা এগোতে পারবে না দলবদ্ধভাবে। ওরাও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করার ঝুঁকি নেবে না।'

কয়েকটা গ্যাস বোমা নিয়ে টানেল থেকে বেরিয়ে প্যাসেজে ঢুকল কুয়াশা।

কুয়াশা বেরিয়ে যেতে বাকি সবাই ব্যাগ খুলে গ্যাস বোমা বের করে পকেটে ভরতে শুরু করল।

কুয়াশা প্যাসেজের তেমাথায় এসে থামল। ডান দিকে চলে গেছে প্যাসেজটা সোজা, শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি। বাঁ দিকে প্যাসেজটা সোজা গিয়ে বাঁক নিয়েছে আবার।

মৃদু একটা শব্দ হতে বাঁ দিকে তাকাল কুয়াশা। একজন লোককে দেখল সে। চিৎকার করতে যাচ্ছে লোকটা। এইমাত্র বাঁক নিয়ে কুয়াশাকে দেখতে পেয়েছে সে।

হাতের গ্যাস বোমাটা ছুঁড়ে দেবার জন্য মাথা নিচু করে ঝুঁকে পড়ল কুয়াশা, মেঝের উপর দিয়ে গড়িয়ে দিল বোমাটাকে।

কুয়াশা নিচু হতেই ওর মাথার উপর দিয়ে কি যেন তীরবেগে উড়ে গেল বাতাসে শিস কেটে।

সামনের লোকটার দিকে চেয়ে ছিল কুয়াশা। অবিশ্বাস ফুটে উঠল তার দুই চোখে। লোকটা দাঁড়িয়েই আছে, কিন্তু তার মুণ্ডুটা খসে পড়ে গেল মেঝেতে। একমুহূর্ত পর ধড়টাও পড়ে গেল। প্যাসেজের শেষ মাথায়, কাঠের দেয়ালে বিদ্ধ হলো একটা ভোজালি।

ঝট্ করে পিছন দিকে তাকাল কুয়াশা।

ডান দিকের প্যাসেজের মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তাল। সেই কুয়াশাকে লক্ষ করে ভোজালিটা ছুঁড়েছিল। ভাগ্য ভাল, ঠিক সেই সময় মাথা নিচু করে ফেলেছিল

কুয়াশা, তাই বেঁচে গেছে সে। উত্তালের নিক্ষিপ্ত ভোজালি তার নিজের দলেরই একজন প্রহরীকে হত্যা করেছে।

সিঁড়ির দিকে একটা গ্যাস বোমা ছুঁড়ে দিল কুয়াশা। উত্তাল দাঁতে দাঁত চেপে কিছু বলতে বলতে পিছিয়ে যাচ্ছে। অদৃশ্য হয়ে গেল সে সিঁড়ির মাথায় উঠে।

পরমুহূর্তে দেখা গেল কয়েকজন লোক হুড়মুড় করে নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে। তাদের পিছন থেকে উত্তাল চিৎকার করছে, 'ধরে আনো শয়তানটাকে। ওকে আমি জ্যান্ত পোড়াব। যাও! এগোও! ভয়ের কিছু নেই।'

সিঁড়ি থেকে প্যাসেজে নেমে এল নিগ্রোর দলটা। একসঙ্গে তীরবেগে ছুটে আসছে তিন চারটে ভোজালি···। কুয়াশা বিদ্যুৎবেগে একপাশে সরে দাঁড়াল।

নিগ্রোদের দলটা হঠাৎ থামল। কাটা কলা গাছের মত ধুপ্ ধুপ্ করে প্যাসেজের উপর পড়ে গেল কয়েকজন। পিছনে যারা ছিল তারা ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে···।

উত্তাল আবার একটা ভোজালি ছুঁড়েছে। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে শূন্য থেকে নিক্ষিপ্ত ভোজালিটার হাতল ধরে ফেলল কুয়াশা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটা উত্তালের দিকে ছুঁড়ে দিল সে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো কুয়াশা। ভোজালিটা গিয়ে লাগল সিঁড়ির পাশে পাশাপাশি সাজানো একটা গ্যাস বেলুনে। লিনেনের আচ্ছাদন, মোটা চামড়ার আবরণ ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেল ভোজালি, বিরাট একটা গহ্বর সৃষ্টি হলো প্রকাণ্ড বেলুনটার গায়ে।

আতঙ্কিত শত্রুরা পড়িমড়ি করে সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠে যাচ্ছিল উপর দিকে, তাদের একজন পা পিছলে পড়ে গেল সেই বেলুনের গায়ে। পড়ল তো পড়ল বেলুনের গায়ে যে গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে তার ভিতর। হাইড্রোজেন গ্যাস সেই মুহূর্তে খুন করল তাকে।

কুয়াশার পাশে এসে দাঁড়াল শহীদ এবং কামাল। ওদের পিছনে বাকি তিনজন।

'তোমরা দু'জন থাকো পিছনে, আর তিনজন এগোও বাঁ দিকে।' নির্দেশ দিল কুয়াশা, 'চারদিকে ছুঁড়তে শুরু করো গ্যাস বোমা।'

হাদি হুসেন মস্ত একটা চেয়ারে তার বিরাট দেহ নিয়ে বসে আছে। কালো মুখটা ঘামে ভিজে গেছে তার।

উত্তাল পায়চারি করছে অস্থিরভাবে। চিৎকার করছে সে, 'তোমার লোকগুলো সব হারামখোর। ওদেরকে টুকরো টুকরো করে শকুনদেরকে খাওয়ানো উচিত। একজন নয়, দুইজন নয়—ছয়জন মানুষ এতগুলো লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে জাহাজে উঠে বসে আছে—কেউ জানতেই পারল না। এ-ও কি সম্ভব! এ-ও কি সহ্য করা যায়?'

হাদি হুসেন মুখ তুলে তাকাল।

'চেঁচিয়ো না। যা হবার হয়েছে। এখন দেখো, কিভাবে কুকুরগুলোকে খতম করা যায়।'

উত্তাল বলল, 'খতম করবে, না খতম হবে? ওদের কাছে গ্যাস বোমা আছে। কেউ এগোতেই পারছে না কাছাকাছি।'

হঠাৎ কোদালের মত বড় বড় দাঁত বের করে হাসল হাদি হুসেন।

'তুমি হাসছ!'

হাদি হুসেন বলল, 'তোমার এই এক দোষ, বড্ড তাড়াতাড়ি নিরাশ হয়ে পড়ো। ওদের কাছে গ্যাস বোমা আছে, ভাল কথা। আমরা কাছাকাছি যেতে পারছি না, ভাল কথা। আমরা আগ্নেয়াস্ত্রও ব্যবহার করতে পারছি না, ভাল কথা। কুয়াশা এবং তার দলবল এবার দুঃসাহসী হয়ে উঠবে, এগিয়ে আসবে তারা কন্ট্রোলরুম দখল করার জন্য—সে-ও খুব ভাল কথা।'

'তার মানে! হাদি, তুমি কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেলে?'

হাদি হুসেন হাসছে, 'না, বন্ধু, না। হাদি হুসেন এই রকম সামান্য বিপদে পাগল হয় না। উত্তাল, তুমি একটা গাধা। আচ্ছা, আমাদের আসল অস্ত্রের কথাটা কি তোমার মনে পড়েনি একবারও?'

'আসল অস্ত্র?'

'হ্যাঁ। ভ্যাম্পায়ার!'

উত্তাল উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, 'আরে! তাই তো! মনেই পড়েনি···!'

হাদি হুসেন বলল, 'যাও, নিয়ে এসো ঝুড়িটা। দেখি কুয়াশা কত বড় বাহাদুর।'

শায়লা পারভিন ওদের কথা শুনছিল। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'না! না! মি. কুয়াশা, সাবধান! এরা আপনাদের···।'

কথা শেষ করতে পারল না শায়লা পারভিন, হাদি হুসেন তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল চেয়ার থেকে।

চার

'যাই বলিস শহীদ, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে! এমন হঠাৎ সব থেমে গেল কেন? কোথাও কোন মানুষের সাড়া শব্দ নেই, ছায়া পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কারও।'

'হুঁ।'

গম্ভীর দেখাচ্ছে শহীদকে।

কুয়াশাও চিন্তিত যেন। জানতে চাইল সে, 'খানিক আগে শায়লার চিৎকার শুনেছ তোমরা কেউ?'

কেউ শোনেনি।

কুয়াশা তার ব্যাগ থেকে আরও গ্যাস বোমা বের করে পকেটে ভরল। বলল, 'তোমরা এখানেই থাকো। আমি ঘুরে দেখে আসি।'

'একা যাবে?' জানতে চাইল শহীদ।

'হ্যাঁ। আমার সন্দেহ হচ্ছে, শত্রুরা তাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে ঝুঁকি বাড়িয়ে লাভ কি।'

সামনের পথ রোধ করে দাঁড়াল সুন্দরী রাজকুমারী ওমেনা, সংক্ষেপে বলল, 'না।'

চোখ তুলে ওমেনার চোখের দিকে তাকাল কুয়াশা। বলল, 'ছি, ওমেনা। কাজের সময় বাধা দিতে নেই।'

ওমেনা দৃঢ় গলায় বলল, 'একা যাওয়া চলবে না তোমার। বিপদ জেনেও একা যেতে দেব না তোমাকে আমি।'

'বিপদের মুখোমুখি হতেই হবে, ওমেনা। সবাই মিলে যদি বিপদের মুখোমুখি হই তাহলে সকলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। তা আমি হতে দিতে পারি না। যে বিপদের আশঙ্কা করছি আমি সেটা ভয়ঙ্কর। সেই ভয়ঙ্কর বিপদের দিকে তোমাদেরকে আমি টেনে নিয়ে যেতে পারব না। আমি যাচ্ছি কেন জানো? যাচ্ছি, বিপদটা এখানে যাতে আসতে না পারে, যাতে বিপদটাকে আমি মাঝপথে বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারি, সেই জন্য। ভাল কথা, আমার কাছ থেকে নির্দেশ না পেলে কেউ এই টানেল ছেড়ে বেরুবে না।'

মাথা নিচু করে এক পাশে সরে দাঁড়াল ওমেনা। কেউ লক্ষ না করলেও কুয়াশা লক্ষ করল, ওমেনার দু'চোখ ভরে উঠেছে নোনা জলে।

অবিচলিত ভঙ্গিতে টানেল থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ ধরে হাঁটতে শুরু করল কুয়াশা। সিঁড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় থমকে দাঁড়াল সে। কান পাতল।

সত্যি ভারি আশ্চর্য লাগছে। কোথাও লোকজনের কোন শব্দ নেই। কাউকে দেখাও যাচ্ছে না কোথাও!

ব্যাপার কি?

সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা প্যাসেজ চলে গেছে। প্যাসেজটা শেষ হয়েছে একটা করিডরে।

প্রশস্ত করিডরটা খাঁ খাঁ করছে। কেউ নেই।

করিডরের মাঝামাঝি গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। কন্ট্রোলরুমটা এই করিডরের উপরেই কোথাও হবে, অনুমান করল। উপর দিকে তাকাল সে।

তাকাতেই কুয়াশা দেখল সিলিংয়ের এক জায়গা থেকে কাঠের একটা গোলাকার ঢাকনি সরে যাচ্ছে।

ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল না কুয়াশা। কিন্তু দ্রুত একটা গ্যাস গ্রেনেড বের করে ফেলল সে।

ঢাকনিটা সরে গেছে। একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। গ্যাস গ্রেনেডটা উপর দিকে ছুঁড়ে দিল কুয়াশা। গর্তের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

কয়েক সেকেণ্ড কাটল। তারপর সেই গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল বিশাল একটা কালো কুচকুচে বড় আকারের বাদুড়—রক্তচোষা বাদুড়!

ভ্যাম্পায়ার!

এই রকম কিছুর জন্যে যেন তৈরি হয়েই ছিল কুয়াশা। নড়ল না সে। দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়।

প্রকাণ্ড বাদুড়টা ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল করিডরের উপর দিয়ে। তারপর বাঁক নিয়ে ফিরে আসতে শুরু করল আবার সেটা।

তীরবেগে উড়ে আসছে বাদুড়টা। এই বাদুড়ের নখে বিষ আছে, জানে কুয়াশা। নখ দিয়ে আঁচড় কাটা মাত্র মৃত্যু অবধারিত।

এসে পড়েছে বাদুড়টা। কুয়াশার মাথা লক্ষ্য করে সোজা উড়ে আসছে কদাকার প্রাণীটা।

শেষ মুহূর্তে বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। এক পাশে সরে গেল সে লাফ দিয়ে।

বাদুড়টা কুয়াশাকে ছাড়িয়ে চলে গেল দূরে। আবার সেটা ফিরে আসছে।

এক পলকে বসে পড়ল কুয়াশা।

কিন্তু এভাবে কতক্ষণ মৃত্যুকে ফাঁকি দেয়া যাবে। দ্বিতীয়বারও স্পর্শ করতে পারেনি তাকে বাদুড়টা। কিন্তু আবার সেটা ফিরে আসছে।

আবার সরে গেল কুয়াশা। এবার সরে গেলেও, বাদুড়টা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া মাত্র বাঘের মত লাফ মারল সে। শূন্যে উঠে গেল তার শরীর। তার হাতটা শকুনের ঠোঁটের মত ছোঁ মারল, বাদুড়টার পিছন দিকটা ধরে ফেলল সে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে সবেগে ছুঁড়ে দিল মেঝের উপর।

থ্যাচ্ করে পড়ল বাদুড়টা মেঝেতে। এবং নিঃসাড় পড়ে রইল। এক আছাড়েই খতম হয়ে গেছে ভয়ঙ্কর ভ্যাম্পায়ারটা।

কালবিলম্ব না করে ছুটল কুয়াশা। প্যাসেজের তে-মাথায় দেখা হলো শহীদের সঙ্গে। গ্যাস মাস্ক খুলে কথা বলল সে।

'আমি কন্ট্রোলরুমে যাচ্ছি,' বলল কুয়াশা, 'তোমরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ো। সম্ভাব্য সব জায়গায়, সব কেবিনে, সব প্যাসেজে গ্যাস বোমা ব্যবহার করো। শত্রুদের একজনও যেন নিষ্কৃতি না পায়।'

কথাগুলো বলেই সিঁড়ির দিকে ছুটল কুয়াশা।

উপরে উঠে একটা গ্যাস বোমা ফাটাল কুয়াশা। পাশাপাশি কয়েকটা দরজা দেখা যাচ্ছে। হালকা হার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি দরজা। হাতের ধাক্কাতেই খুলে গেল দরজাগুলো। প্রতিটি কেবিনের ভিতর একটা করে গ্যাস বোমা নিক্ষেপ করল কুয়াশা।

কেউ বাধা দিল না তাকে। কন্ট্রোল রুমে প্রবেশ করল সে।

শায়লা পারভিনের অজ্ঞান দেহটা চোখে পড়ল প্রথমেই।

হাদি হুসেন বা উত্তাল—কেউ নেই। ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। প্রথমেই চোখ পড়ল ফুয়েল ইণ্ডিকেটরের দিকে।

ফুয়েল প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ওয়াটার ট্যাঙ্কগুলো প্রায় শূন্য। গ্যাস ভর্তি বেলুনগুলো ঢিলে হয়ে পড়েছে। আর বড় জোর ঘণ্টা দুয়েক শূন্যে ভাসতে পারবে ব্লু-বার্ড।

শায়লার হাতের বাঁধন খুলে ফেলল কুয়াশা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই। তার অচেতন দেহটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এল সে বাইরে।

ইন্সপেকশন টানেলে ফিরে এসে কুয়াশা কাউকে দেখতে পেল না। অবশ্য মিনিট তিনেক পরই ফিরল ওমেনা এবং রাসেল, ওদের পিছু পিছু এল শহীদ, কামাল এবং ডি.কস্টা।

'হাদি হুসেন বা উত্তালকে দেখেছ তোমরা?'

শহীদ বলল, 'না। ব্লু-বার্ডে সম্ভবত একটা নিরাপদ গোপন কুঠরি আছে,

সেখানেই লুকিয়েছে ওরা।'

ওমেনা বলল, 'ওদের দু'জনের কথা বলতে পারি না। কিন্তু বাকি সবাই গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে।'

কুয়াশা শায়লা পারভিনের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। বলল, 'শহীদ, ব্লু-বার্ড সম্ভবত ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। দেখো তো, নিচের দুনিয়াটা কি রকম?'

শহীদ একা নয়, ওর সঙ্গে ওমেনা এবং ডি.কস্টাও বেরিয়ে গেল।

টানেলের শেষ মাথায় গিয়ে পোর্টহোলের পর্দা সরিয়ে নিচের দিকে তাকাল ওরা চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে।

'মাই গড!'

আশ্চর্য একটা দৃশ্য ওদের চোখের সামনে ফুটে উঠল নিচের দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে।

ব্লু-বার্ড এখনও হাজারখানেক ফুট উপরে রয়েছে। বহু নিচে দেখা যাচ্ছে বনভূমি। এমন গভীর ঘন সবুজ বনভূমি এর আগে ওরা কেউ দেখেনি। গাছগুলো এমন অস্বাভাবিক ভাবে ঘনসন্নিবেশিত যে মনে হচ্ছে একটা গাছের গা থেকে আর একটা গাছ গজিয়েছে, গাছে গাছে এতটুকু ফাঁক নেই। গাছগুলোও দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওদের। কিছু কিছু প্রকাণ্ড হলুদ ফুল চোখে পড়ল, এক একটা হাতির কানের মত বড়।

মরুভূমির কোন চিহ্ন নেই কোথাও। বহুদূরে দেখা যাচ্ছে পাহাড়শ্রেণী। আফ্রিকা মানেই মরুভূমি এবং বনভূমি। এর আগে একাধিক বার আফ্রিকার জঙ্গলে এসেছে ওরা। কিন্তু সেই জঙ্গলের সঙ্গে নিচের এই জঙ্গলের যেন কোন মিলই নেই। তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের সকলের মনে অদ্ভুত একটা অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে। নিচের এই বনভূমির ভিতর কিছু একটা যেন আছে। এমন একটা কিছু যা ভয়ঙ্কর, যা স্বাভাবিক নয়।

বনভূমির আয়তনটা বিশাল নয়। বনভূমি না বলে প্রকাণ্ড একটা মরুদ্যান বলা চলে এটাকে।

অনাবিষ্কৃত মরুদ্যান হয়তো এটা। সভ্য দুনিয়ার মানুষ হয়তো এই মরুদ্যানের কথা জানে না আজও।

ছোট ছোট কালো কালো বিন্দু উড়ে বেড়াচ্ছে মরুদ্যানের উপর। বিন্দুর মত দেখতে ওগুলো পাখি জাতীয় কিছু হবে বলে মনে হলো।

শহীদ বলে উঠল, 'ফেরাউনের মুরগী ওগুলো।'

'হোয়াট!'

ডি.কস্টার সঙ্গে ওমেনাও জানতে চাইল, 'ফেরাউনের মুরগী মানে?'

'শকুন। লক্ষ করে দেখো, আমরা যে ধরনের শকুন সাধারণত দেখে থাকি এগুলো সে রকম নয়। ওদের বৈশিষ্ট্য ওদের ঠোঁটে এবং ডানায়। ডানাগুলো সাধারণের চেয়ে বড় এবং ঠোঁটগুলো সরু, ছুঁচাল। এই ধরনের শকুনকে ফেরাউনের মুরগী বলা হয়।'

ওমেনা বলল, 'শকুন বা ফেরাউনের মুরগী যাই বলো—ওরা মড়া খায়।'

'খায় বৈকি।' বলল কামাল।

'মরুদ্যানের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ওরা? ওই গভীর জঙ্গলে কি আছে?'

শহীদ বলে উঠল, 'একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছিস, কামাল?'

'কি রে?'

'শকুনগুলো মরুদ্যানের উপর ঘুরছে আর ঘুরছে। কিন্তু জঙ্গলের কাছাকাছি নামছে না একটাও। কি কারণ? আমার যেন মনে হচ্ছে শকুনগুলো জঙ্গলটাকে ভয় করছে রীতিমত।'

রাসেল বলল, 'তাজ্জব ব্যাপার, সন্দেহ নেই। কোথাও আর কোন রকম পাখি জাতীয় কিছু নেই। শুধু শকুন দেখা যাচ্ছে।'

'যত্তো সব ফালতু কথাবার্তা! ওই তো একটি শকুন জঙ্গলে নামিটেছে।'

ডি.কস্টা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রায় চিৎকার করে উঠল। মিথ্যে বলেনি সে। সত্যি সত্যি দেখতে পেল সবাই দৃশ্যটা, একটি শকুন জঙ্গলের দিকে তীরবেগে নামছে।

সবুজ বনভূমিতে নামল শকুনটা। বসল সে এক জায়গায়। ঠোঁট দিয়ে কি যেন তুলে নিচ্ছে সে। নিশ্চয়ই খাদ্য জাতীয় কিছু।

কয়েক সেকেণ্ড পরই শকুনটা শূন্যে ডানা মেলে ওড়ার চেষ্টা করল। সবেগে ডানা ঝাপটাচ্ছে সে। কিন্তু শূন্যে উঠতে পারছে না। সবুজ একটা বড় আকারের পাতা, যেটার উপর নেমেছে শকুনটা, তাকে আটকে রেখেছে। উন্মাদের মত নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে শকুনটা। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করছে তাকে প্রকাণ্ড পাতাটা। চিৎ করে মেলে রাখা ছাতা যেন সেটা। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার, শকুনটাকে গ্রাস করে ফেলল সেই পাতা। অদৃশ্য হয়ে গেল শকুনটা।

'কী সাংঘাতিক! এ যে খুনী কারনিভোরোস প্ল্যান্ট। দুর্গম বনভূমিতে জন্মায় সাধারণত। পোকা মাকড়, ছোট ছোট পশু-পাখি পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।'

শহীদ থামতেই কামাল বলে উঠল, 'কিন্তু শকুনটা তো ছোটখাট নয়···।'

'তা বটে। বিশেষ কোন কারণে প্ল্যান্টগুলো বিরাটাকার পেয়েছে সম্ভবত!'

ডি.কস্টা আঙ্গুল দিয়ে অন্য একটা দিক দেখাল, 'ওই ডিকটাই হামাডের গন্তব্যস্থান, আই গেস।'

মরুদ্যানের মাঝখানে তাকাল সবাই ডি.কস্টার কথা শুনে।

চারপাশে সবুজ জঙ্গল থাকলেও মাঝখানটায় সবুজের ছিটে-ফোঁটাও নেই। বনভূমির চেয়ে মধ্যবর্তী জায়গাটা অপেক্ষাকৃত উঁচু। পাথরের কঠিন চেহারা এত উঁচু থেকেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

জায়গাটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমানই হবে। মাইল খানেক দীর্ঘ, চওড়া একটু বুঝি কমই। ছোট বড় অসংখ্য পাথরের খণ্ড দেখা যাচ্ছে।

বু-বার্ড মৃদু মন্দ বাতাস পেয়ে সেদিকেই এগোচ্ছে। বিনকিউলারের সাহায্যে ওরা পাথুরে জায়গাটার নানারকম বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে শুরু করল।

শহীদ বলল, 'ঠিক মাঝখানটায় ওটা কি? একটা মঞ্চের মত দেখতে যেন?'

কামাল চিৎকার করে উঠল, 'মানুষ! মঞ্চের উপর মানুষ!'

সত্যি তাই। কালো একদল মানুষ মঞ্চের উপর উঠে আসছে দেখা গেল।

'ওটা সম্ভবত ব্লু-বার্ডের ল্যাণ্ডিং স্টেজ।'

শহীদ সমর্থন করল ওমেনাকে, 'তোমার অনুমানই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।'

র‍্যাসেল আবিষ্কার করল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিসটা। প্রকাণ্ড একটা কারাকক্ষের মত দেখতে সেটা। চার কোনা কারাকক্ষই ওটা। লোহার মোটা এবং লম্বা পিলার পাশাপাশি মাটিতে পুঁতে তৈরি করা হয়েছে কারাকক্ষটাকে। এক দিকে প্রকাণ্ড একটা লোহার গেট। পিলারগুলোর মাথা ছুঁচাল।

কারাকক্ষের ভিতর অসংখ্য মানুষ শুয়ে বসে আছে। এক একটা দলে দশ বারোজন করে লোক। দলের প্রতিটি লোককেই লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ব্লু-বার্ড কারাকক্ষের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। একটু পরই সেটা চোখের আড়ালে, পিছনে সরে গেল।

সামনে দেখা গেল আরও একটা জিনিস। গভীর গহ্বর একটা। সরু সরু পথ নেমে গেছে প্রকাণ্ড খাদের ভিতর দিকে। খাদটার উপর দিয়ে ব্লু-বার্ড উড়ে যাচ্ছে, ওরা দেখল খাদের নিচে শিকল দিয়ে বাঁধা আরও কিছু বন্দি রয়েছে।

খাদের পাশে উঁচু হয়ে রয়েছে মাটি। খাদের ভিতর থেকে খুঁড়ে তুলে আনা হয়েছে এই মাটি। মাটিগুলো নীল রঙের। সবুজ ভাবও রয়েছে একটু।

শহীদ বলল, 'ক্রীতদাস সম্পর্কিত কথাটা তাহলে মিথ্যে নয়।'

'খাদটার ভিতর কি করছে ওরা?'

'মাটি খুঁড়ছে। নীল রঙের মাটি—বুঝতে পারছিস না রহস্যটা?'

কামাল বলল, 'ওহ্ হো! বুঝেছি! ডায়মণ্ড মাইন!'

নীল মাটি মানেই ডায়মণ্ডের খনি! শায়লা পারভিন নিশ্চয়ই এই খনি থেকে ডায়মণ্ডগুলো সংগ্রহ করেছিল।

শহীদ বলল, 'তার জ্ঞান ফিরেছে কিনা দেখা দরকার এবার।'

পাঁচ

শায়লা পারভিনের জ্ঞান আগেই ফিরেছে। ওরা যখন ফিরল তখন সে বলছিল, 'মি. কুয়াশা, আমার দুর্ভাগ্য যে, বিউটি কুইনে আপনাকে আমি চিনতে পারিনি। আপনাকে আমি শত্রু মনে করেছিলাম···।'

কুয়াশা বলল, 'শায়লা, তোমার কথা পরে শুনব। জরুরী কাজগুলো সেরে ফেলতে হবে আমাদের এখুনি।'

উঠে দাড়িয়ে পোর্টহোলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা।

'একি! হাদি হুসেন আর উত্তাল নিচে নামল কিভাবে।'

পরমুহূর্তে শোনা গেল রাইফেলের শব্দ। বিদ্যুৎবেগে সরে গেল কুয়াশা জানালার সামনে থেকে।

কিন্তু অঘটন একটা ঘটে গেছে তখন। ব্লু-বার্ডের উপরকার একটা গ্যাস ভর্তি গম্বুজ ফুটো হয়ে গেছে বুলেট লেগে।

'ব্লু-বার্ড নামছে···নিচে নামা মাত্র আক্রান্ত হব আমরা,' শহীদ বলে উঠল।

কুয়াশা বলল, 'হাদি হুসেন আর উত্তাল সম্ভবত প্যারাস্যুটের সাহায্যে নেমে গেছে।

কুয়াশা বলল, ব্লু-বার্ডের সামনে এবং পিছনের দিকে দুটো মোটা শিকল ঝুলছে। চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ লম্বা। ওগুলো ধরে টেনে মঞ্চে নামাবে ব্লু-বার্ডকে শত্রুরা। ওমেনা, কন্ট্রোলরুমে চলো তুমি আমার সঙ্গে।'

কন্ট্রোলরুমে গিয়ে ঢুকল সবাই।

দ্রুত নামছে ব্লু-বার্ড। অসাবধানবশত একজন লোক রাইফেলের গুলি ছুঁড়লেও হাদি হুসেনের ধমক খেয়ে সবাই সাবধান হয়ে গেছে। গুলি ছোঁড়বার ঝুঁকি আর নেবে না কেউ ভুলেও।

পোর্টহোল দিয়ে সবাই চেয়ে আছে নিচের দিকে। আফ্রিকান নিগ্রোর দলটা হাদি হুসেন আর উত্তালের নেতৃত্বে উত্তেজিতভাবে অপেক্ষা করছে। লোহার শিকল আওতার মধ্যে আসার অপেক্ষায় আছে ওরা। শিকলগুলো আওতার মধ্যে পেলেই ধরে মঞ্চের উপর নামিয়ে আনবে ব্লু-বার্ডকে।

কন্ট্রোলরুমে কুয়াশাকে সাহায্য করছে ওমেনা। তার, কয়েল, সুইচবোর্ড নিয়ে দ্রুত কাজ করছে ওরা।

ব্লু-বার্ডের দুই প্রান্তের শিকল মাটির কাছাকাছি নেমে গেল।

চিৎকার করে নির্দেশ দিচ্ছে হাদি হুসেন।

নিগ্রোর দল শিকল দুটো ধরে ফেলেছে। প্রাণপণ শক্তিতে টানছে তারা, মঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ব্লু-বার্ড।

মঞ্চের উপর থেকে ব্লু-বার্ড আর মাত্র কয়েক গজ উপরে—এমন সময় সুইচ অন করল কুয়াশা।

নিগ্রোর দলটা বৈদ্যুতিক ধাক্কা খেয়ে তীরবেগে ছিটকে পড়ল চারদিকে।

কুয়াশা নির্দেশ দিল, 'গ্যাস বোমা।'

নির্দেশ পেতে যা দেরি, সবাই নিচের দিকে ছুঁড়তে শুরু করল গ্যাস বোমা।

'নামো।'

লাফ দিয়ে নামল কুয়াশা মঞ্চের উপর। তার পিছু পিছু শহীদ, শায়লা পারভিন, কামাল, ডি.কস্টা, ওমেনা এবং রাসেল। মঞ্চ থেকে নেমে ছুটল সবাই।

দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। হাত বাড়িয়ে শ'খানেক গজ দূরের একটা জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে সে সবাইকে, 'ওদিকে! ওদিকে শেলটার নিতে হবে।'

গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে ঢলে পড়েছে শত্রুদের কেউ কেউ সাময়িক ভাবে। বাকিরা সবাই পিছিয়ে গেছে।

কুয়াশা আর তার দলবল ব্লু-বার্ডের পিছন দিকে পৌঁছে গেছে, ছুটছে তারা। দেখেও কেউ গুলি করল না। গুলি করার ঝুঁকি নিতে রাজি নয় শত্রুরা। ব্লু-বার্ড তাদের একমাত্র ভরসা। ওটা ধ্বংস হয়ে গেলে যাতায়াত, খাদ্য পরিবহন ব্যবস্থা, সব অচল হয়ে যাবে।

বেশ খানিকটা দূরত্ব অতিক্রম করে থামল ওরা। বড় বড় পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে পড়ল, কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখল একপাশে।

'পাথর দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করতে হবে।' কথাটা বলে সবার আগে কাজে

লেগে গেল শহীদ। সবাই ওর সঙ্গে যোগ দিল। ছোটবড় পাথরের টুকরো সাজিয়ে চার-পাঁচ হাত উঁচু একটা পাঁচিল তৈরি করে ফেলল ওরা নিজেদের সামনে।

দশ মিনিট কেটে গেছে। সন্ধ্যা নামছে দ্রুত।

শত্রুপক্ষ দূর থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। কিন্তু এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে না কেউ।

'কিন্তু এখানে এভাবে ব্যারিকেড তৈরি করে কতক্ষণ বাধা দিয়ে রাখতে পারব আমরা শত্রুদেরকে? খাবার নেই, পানি নেই—শেষ পর্যন্ত তো আত্মসমর্পণ করতেই হবে।'

'সমস্যা আসুক, তখন দেখা যাবে। এই মুহূর্তে আমরা বেশ শান্তিতে আছি।'

কামালের কথার উত্তরে বলল কুয়াশা। শয়িলা পারভিনের দিকে তাকাল সে, 'এবার তোমার কথা শোনা যেতে পারে।'

শয়িলা পারভিন একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল। একটু ভেবে নিয়ে শুরু করল সে, 'হাদি হুসেনের কথা দিয়ে শুরু করি। তার আগে বলে নেই, আমি ওদের সম্পর্কে ওদের মুখেই ছাড়া ছাড়া ভাবে সব শুনেছি। হাদি হুসেন আসলে একজন বেদুইন সর্দার ছিল। মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলা লোকজনের ধন-সম্পদ লুঠ করাই ছিল তার এবং তার দলের লোকের পেশা। আজ থেকে বারো বছর আগে, আফ্রিকার এক জঙ্গলে আস্তানা ছিল ওদের। সেই সময় ওই ব্লু-বার্ড আফ্রিকার উপর দিয়ে যাচ্ছিল আরও পশ্চিম দিকে। গোলমাল দেখা দেয়ায় পাইলট বাধ্য হয়ে বনভূমিতে নামায় ব্লু-বার্ডকে। হাদি হুসেনের দল ব্লু-বার্ডকে দেখতে পায়। লুঠ করার এমন সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে না তারা। রাত্রির অন্ধকারে দলবল নিয়ে হাদি হুসেন আক্রমণ করে ব্লু-বার্ডকে। ব্লু-বার্ডের অধিকাংশ আরোহীকে হত্যা করে ওরা। বন্দি করে পাইলট আর উত্তাল চৌধুরীকে। ওদের দু'জনকে হাদি হুসেন হত্যা করেনি, কারণ, সে বা তার কোন লোক ব্লু-বার্ডকে চালাতে পারবে না তা সে জানত। পাইলট ও উত্তালকে দলে যোগ দেবার প্রস্তাব দেয় হাদি হুসেন। উত্তাল তার প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু পাইলট ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর হাদি হুসেন উত্তালের সাহায্যে ব্লু-বার্ডের ইঞ্জিন মেরামত করে। পাইলটকে হত্যা করে ফেলে দেয় ওরা ভূমধ্যসাগরে।'

'তারপর? এই মরুদ্যানের সন্ধান পেল কিভাবে ওরা?' কামাল জানতে চাইল।

'বলছি। ব্লু-বার্ড দখল করে ওরা সিদ্ধান্ত নেয় দাস-ব্যবসা শুরু করবে। আফ্রিকার বিভিন্ন অসভ্য দেশ থেকে অসহায় নর-নারীকে কিনে অন্যত্র বিক্রি করার ব্যবসা করতে শুরু করল ওরা। দু'তিন বছর এভাবে কাটল। হাদি হুসেন এবং উত্তাল পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু হয়ে উঠল। এমন সময়, একদিন গোটা আফ্রিকায় দাস ব্যবসা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। নিষিদ্ধ হলেও ব্যবসাটা ত্যাগ করল না ওরা। ফলে বিভিন্ন দেশের পুলিস বিভাগ ওদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগল। গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হলো ওদের বিরুদ্ধে। পুলিসের ভয়ে অতিষ্ঠ হয়ে ওরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগল। তারপর, একদিন এই এলাকায় এসে মরুদ্যানটা আবিষ্কার করে ওরা। লক্ষ করে শকুনগুলোকে। শকুনগুলো তখন উজ্জ্বল ডায়মণ্ড পায়ের

আঙ্গুলে নিয়ে উড়ে বেড়াত। শকুনের পায়ে ডায়মণ্ড দেখে এই পাথুরে জায়গায় নামে ওরা। আবিষ্কার করে ডায়মণ্ড মাইন।'

'বলে যাও।'

'খনি দেখে এই জায়গায় থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। দূর এলাকা থেকে ধরে আনে অসহায় লোকজন, বন্দি করে রাখে তাদেরকে, খনির নিচে নামিয়ে মাটি কাটায়। তাদেরকে খেতে দেয় চব্বিশ ঘন্টায় মাত্র একবার। অকারণে বেদম প্রহার করে। ওদের নিজস্ব লোক আছে কায়রোয়। তাদের মাধ্যমেই ডায়মণ্ড বিক্রি করে ওরা। তাদের সাহায্যেই নতুন নতুন ক্রীতদাস সংগ্রহ করে। বন্দিরা এখানে কেউই বেশিদিন বেঁচে থাকে না। তাই নতুন লোক দরকার হয়।'

'তুমি কিভাবে ওদের হাতে পড়লে?'

শায়লা পারভিন বলল, 'ফ্লাইং ক্লাবের একটা প্লেন নিয়ে ঢাকা থেকে আসছিলাম আমি। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আকাশ পথে আফ্রিকা পাড়ি দেব, এটা ছিল আমার প্রচণ্ড একটা শখ। সেই শখের বশবর্তী হয়েই যাত্রা করি আমি। এই মহাদেশের সর্ব পশ্চিমে যাবার পরিকল্পনা ছিল আমার। কিন্তু ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেয়ায় আমি এখান থেকে মাইল দশেক পুবে একটা সমতল ভূমিতে প্লেন নামাতে বাধ্য হই। আমার সঙ্গে মালেক আর এনায়েত ছিল। আমাদের তিনজনকেই বন্দি করে হাদি হুসেনের লোকেরা। আমার সঙ্গী দু-জনকে ক্রীতদাস হিসেবে বন্দি করে রাখলেও, আমাকে হাদি হুসেন বন্দি করেনি। আমি বিনা বাধায় সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতাম। হাদি হুসেনের উদ্দেশ্য ছিল খারাপ, সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। আমি নানা অজুহাত দেখিয়ে শুধু সময় নিচ্ছিলাম। সেই ফাঁকে গোপনে আমি একটা গ্যাস বেলুন তৈরি করতে চেষ্টা করছিলাম। প্রচুর হাইড্রোজেন গ্যাস মওজুদ ছিল এখানে, ব্লু-বার্ডের জন্যে ওরা কিনে এনে রেখেছিল। সেই গ্যাস চুরি করে আমি একটা বেলুন তৈরি করি। এবং এক সুযোগে আমার সঙ্গীদের নিয়ে পালিয়ে যাই। বাতাস অনুকূল ছিল, আমরা বনভূমি পেরিয়ে বহু দূরের একটা লোকালয়ে নামি। সেখান থেকে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে পৌঁছাই একটা সামুদ্রিক বন্দরে। বিউটি কুইন সেই সময় যাত্রা করার জন্য তৈরি হচ্ছিল, আমরা তাতে আরোহণ করি। কিন্তু হাদি হুসেন আর উত্তাল ব্লু-বার্ড নিয়ে আমাদেরকে ধাওয়া করে। আকাশে মেঘ ছিল বলে তারা বিউটি কুইনকে দেখতে পায়নি। যাক, ওরা আমাদেরকে হত্যা করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে আসছে বুঝতে পেরে আমি বিউটি কুইনের রেডিওর সাহায্যে চট্টগ্রামের সংবাদপত্রগুলোতে আপনার সন্ধান পাবার জন্য দশ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যবস্থা করি…।'

কুয়াশা বলল; 'বুঝতে পারছি সব। আর বলতে হবে না। কিন্তু ভ্যাম্পায়ার সম্পর্কে কিছু বললে না যে?'

শিউরে উঠল শায়লা পারভিন। সিধে হয়ে বসল সে। আঁকড়ে ধরল পাশে বসা ওমেনার একটা হাত। অন্ধকারে চাপা কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল সে।

'ওই বাদুড়গুলো—ওরা রক্ত শুষে নেয়। প্রথমে ভেবেছিলাম পায়ের নখে বিষ নিয়েই জন্মায় ওরা। আসলে তা নয়। ওদের নখে বিষ মাখিয়ে দেয়া হয়। বড়

ভয়ঙ্কর বিষ—রক্তের সংস্পর্শে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটে। অসভ্য একটা জংলী উপজাতি এই রক্ত-চোষা বাদুড় পোষে। সেই উপজাতির সর্দাররা নিজেদের পদ্ধতিতে পোষ মানায় এদেরকে। হাদি হুসেন সেই উপজাতির সঙ্গে কিছুদিন ছিল। উপজাতির সর্দাররা শত্রুদের হত্যা করার জন্য এই বাদুড় পাঠাত। সেখান থেকে পালিয়ে আসার সময় কয়েক জোড়া বাদুড় নিয়ে আসে হাদি হুসেন। তাদের বাচ্চা হয়—অসংখ্য। হাদি হুসেন নিজে পোষ মানিয়েছে সবক'টাকে। পোষ মানানো ঠিক যায় না এদেরকে। এরা কয়েকটা শব্দ শুনে সাড়া দেয়—এই যা। সামনে যাকে পাবে তাকেই আক্রমণ করবে এরা। হাদি হুসেন বাদুড়গুলোকে ব্যবহার করে ক্রীতদাসদের বিরুদ্ধে। কেউ পালাবার চেষ্টা করলে তাদের খাঁচা খুলে দেয় সে—বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আছে।'

শায়লা পারভিন থামতে শহীদ বলল, 'অবাক লাগছে বড়, কুয়াশা। শত্রুরা চুপচাপ কেন? হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কথা নয় ওদের!'

কামাল বলল, 'উঁহুঁ—নিশ্চয়ই ওরা কোন প্ল্যান করছে।'

চিৎকার করে উঠল শায়লা পারভিন, 'ভ্যাম্পায়ার! রক্ত চোষা বাদুড় ছেড়ে দিয়েছে ওরা। মি. কুয়াশা, বাঁচান! বাঁচান!'

ছয়

ঘন অন্ধকারে ঢাকা চারদিক। বাদুড় আসছে দলে দলে। দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে খসখসে শব্দ, ডানা ঝাপটাবার আওয়াজ।

গ্যাস-মাস্ক পরবার সময় নেই। সুতরাং গ্যাস বোমা ব্যবহার করার প্রশ্নই উঠল না।

শহীদের মোটা ব্যাগটা টেনে নিল কুয়াশা নিজের কাছে। ইনফ্রা-রেড হ্যারিকেন এবং ফ্লুরোসস্কোপিক চশমা বের করল সেটা থেকে।

হ্যারিকেনের সুইচ অন করে চশমা পরে নিল কুয়াশা।

'চশমা পরো—সবাই!'

কুয়াশা দেখল মাথার উপর দুটো রক্তশোষক বাদুড় চক্কর মারছে। স্টেনগানটা উঁচু করে ধরল সে। গর্জে উঠল সেটা।

গর্জে উঠল আরও দুটো স্টেন। ব্রাশ ফায়ারের অবিরাম শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবে যেন। ধুপ ধাপ শব্দ হচ্ছে। ওদের চারদিকে পড়ছে অসংখ্য বাদুড়ের নিষ্প্রাণ দেহ, রক্ত পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটার মত।

কিন্তু কত আর মারা যায়। বাদুড়ের দল আসছে তো আসছেই।

নতুন ম্যাগাজিন ক্লিপ লাগাবার সময় শহীদ লক্ষ করল হাত দুটো কাঁপছে ওর।

চিৎকার করে উঠল কামাল, 'শহীদ!'

স্টেন ফেলে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শহীদ। কামালের গলায় ঠোকর মারার জন্য একটা বাদুড় নেমে এসেছে। ডান হাত দিয়ে আঘাত করল শহীদ। ভাগ্য ভাল, ওর হাতে বাদুড়টা নখ বসাতে পারেনি। হাতের বাড়ি খেয়ে ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল

সেটা, কিন্তু পরমুহূর্তে শূন্যে উড়ল। আবার এগিয়ে আসছে সেটা মাথার উপর দিয়ে···।

কুয়াশার স্টেন গর্জে চলেছে। বাদুড়টা নেমে আসছে তীর বেগে শহীদকে লক্ষ্য করে।

কামাল সামলে নিয়েছে নিজেকে। হাতের রিভলবার তুলে ধরল সে। লক্ষ্য স্থির করেই গুলি করল। অব্যর্থ লক্ষ্য। বাদুড়টা ধুপ করে পড়ে গেল কয়েক হাত দূরে।

কুয়াশার স্টেন থেকে কোন শব্দ আসছে না দেখে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল শহীদ। দেখল গ্যাস-মাস্ক পরে নিয়েছে সে কখন যেন। গ্যাস-বোমা দেখা যাচ্ছে তার হাতে।

'আমি স্টেন চালাচ্ছি,' বলে উঠল কুয়াশা, 'তোমরা সবাই গ্যাস মাস্ক পড়ে নাও জলদি!'

সবাই পালন করল কুয়াশার নির্দেশ।

বাদুড়ের দল আরও আসছে। কুয়াশা বলে উঠল, 'এভাবে হবে না। গ্যাস বোমা ব্যবহার করছি আমি!'

কুয়াশার স্টেন থামতে গর্জে উঠল শহীদ এবং রাসেলের স্টেন।

কুয়াশা দাঁত দিয়ে পিন খুলে ডিম্বাকৃতি সাদা গ্যাস-বোমা ছুঁড়ে দিল আকাশের দিকে। শূন্যে গিয়ে বিস্ফোরিত হলো সেটা। পরপর আরও দুটো বোমা ছুঁড়ল সে।

সাদা ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল আকাশ।

বাদুড়ের দলগুলো বোঁটাচ্যুত ফলের মত পড়তে লাগল চারদিকে।

কয়েকমুহূর্ত পর নিস্তব্ধতা নামল। বাদুড়ের দল বেশির ভাগই খতম হয়ে গেছে। অল্প কিছু সংখ্যককে সঙ্কেত পাঠিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে হাদি হুসেন।

গম্ভীর শোনাল শহীদের গলা, 'শত্রুরা এরপর কি করবে সেটাই ভাববার বিষয়। ওদের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর অস্ত্রও ব্যর্থ হয়েছে। মরিয়া হয়ে উঠবে এবার ওরা।'

কামাল বলল, 'কিছু না করাটাও সবচেয়ে বড় করা, শহীদ। এভাবে কতক্ষণ থাকতে পারব আমরা? পানি নেই খাবার নেই···।'

সময় বয়ে চলল। রাত গভীর হচ্ছে। অস্বস্তিকর নীরবতা চারদিকে।

রাসেল বলল, 'ইনফ্রা-রেড হ্যারিকেনের আলো বেশিক্ষণ পাব না আমরা। ব্যাটারি ক্ষয় হচ্ছে।'

'নিভিয়ে দিলেই হয় আপাতত।'

রাসেল নিভিয়ে দিল হ্যারিকেনটা।

আধঘণ্টা পর শহীদ ডাকল, 'কুয়াশা?'

কুয়াশার তরফ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না।

হ্যারিকেনের সুইচ অন করল রাসেল।

সবাই দেখল, ওদের সঙ্গে কুয়াশা কেন, কুয়াশার ছায়া পর্যন্ত নেই।

বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে কুয়াশা। আফ্রিকান প্রহরীরা টর্চ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারপাশে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে কুয়াশা ব্লু-বার্ডের দিকে। গতি খুব মন্থর। একহাত, আধহাত করে এগিয়ে যাচ্ছে সে, দেখে নিচ্ছে চারদিক, আবার

এগোচ্ছে।

ব্লু-বার্ডের কাছাকাছি একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠল। একজন প্রহরী সিগারেট ধরাল। সেই আলোয় ব্লু-বার্ডের কাঠামোটা দেখে নিল কুয়াশা। আরও এগিয়ে যাবার পর কুয়াশা বুঝতে পারল ব্লু-বার্ডের উপর বহু লোক রয়েছে। বৈদ্যুতিক আলো জেলে মেরামতের কাজ করছে হাদি হুসেনের লোকেরা। ব্লু-বার্ড শত্রুদের সবচেয়ে বড় ভরসা। মেরামতের কাজে হাত দিতে তাই দেরি করেনি।

পিছনের শেকলের কাছে কোন প্রহরী নেই দেখে খুশি হলো কুয়াশা। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল সে। শেকলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কেউ লক্ষ করছে কিনা দেখার জন্য দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর শিকল ধরে ঝুলতে ঝুলতে উঠতে শুরু করল উপরে। নিরাপদে উঠে গেল কুয়াশা। টানেল ধরে এগোল সে। ব্লু-বার্ডের বহিরাবরণ মেরামতের কাজ চলছে। অভ্যন্তরে লোকজন নেই। থাকলেও কাউকে দেখতে পেল না কুয়াশা। মই বেয়ে সে সোজা নেমে গেল ইঞ্জিন রুমে। আলখেল্লার পকেট থেকে একটা রেঞ্চ বের করে পাঁচটা ইঞ্জিন থেকেই একটা করে ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্ট খুলে নিল সে। পকেট থেকে রুমাল বের করে পার্টগুলো বাঁধল। ব্লু-বার্ড থেকে নেমে এল কুয়াশা নিরাপদেই।

নিচে নেমে কাছাকাছি বালির নিচে পুঁতে রাখল সে রুমালসহ পার্টগুলো।

বেছে বেছে এমন কয়েকটা যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে এসেছে কুয়াশা, যেগুলো ছাড়া ব্লু-বার্ড আকাশে উড়তে পারবে না। ইঞ্জিনগুলো স্টার্টই নেবে না।

ব্লু-বার্ডের সাহায্যে ওদের উপর বোমা ফেলতে পারবে না শত্রুরা, এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে এখন।

পিছিয়ে না গিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল কুয়াশা লোহার পিলার দিয়ে তৈরি বিশাল কারাকক্ষের দিকে।

দূর থেকেই একজন প্রহরীকে দেখতে পেল কুয়াশা। লোকটা পায়চারি করছে।

কাছাকাছি গিয়ে থমকে দাঁড়াল সে। কটু গন্ধ ঢুকছে নাকে। সতর্ক হয়ে উঠল ওর দৃষ্টি এবং কান। বাদুড়ের গন্ধ।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও বাদুড়ের আগমন ঘটল না। আবার এগোতে শুরু করল সে। প্রহরীটা ফিরে আসছে আবার কারাকক্ষের গেটের দিকে।

দূর থেকে নিক্ষেপ করল কেউ উজ্জ্বল টর্চের আলো। কারাকক্ষের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রহরীটা। তার গায়ে পড়েছে টর্চের আলো।

এক মুহূর্ত পর নিভে গেল আলো। কিন্তু এই এক মুহূর্তে অত্যাশ্চর্য একটা জিনিস দেখে ফেলেছে কুয়াশা।

প্রহরীটা একটা খাঁচার ভিতর পায়চারি করছে। লোহার শিক দিয়ে তৈরি খাঁচার তল নেই। খাঁচাটা এমনভাবে তৈরি যে তার ভিতরে একজন লোক অনায়াসে দাঁড়াতে পারে। লোকটার হাঁটা-চলার কোন অসুবিধে হয় না।

খাঁচার ভিতর প্রহরী! রহস্যটা কি! রহস্যটা অনুমান করতে অসুবিধে হলো না কুয়াশার। রক্তচোষা বাদুড়ের কবল থেকে রক্ষার ব্যবস্থা হলো ওই খাঁচা।

টর্চের আলো মাঝে মধ্যেই জ্বলছে। প্রহরীরা নিজেদের লোকের গায়ে আলো

ফেলে দেখে নিচ্ছে—শত্রু না মিত্র।

সেই আলোয় কুয়াশা দেখল কারাকক্ষের কাছ থেকে পনেরো বিশ গজ দূরে বাঁশের ঝুলন্ত মাচার উপর সারি সারি সাজানো রয়েছে ছোট ছোট চারকোনা লোহার শিক দিয়ে তৈরি করা খাঁচা।

বাদুড়ের গন্ধ পাবার কারণ পরিষ্কার হয়ে গেল। পাশাপাশি পঁচিশ ত্রিশটা খাঁচা দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি খাঁচায় একটি করে রক্তশোষক বাদুড় রয়েছে। প্রতিটি খাঁচার সঙ্গে তার-এর যোগাযোগ রয়েছে। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে খাঁচার দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় প্রয়োজনের সময়।

প্রহরীটা আবার টহল দিতে দিতে দূরে সরে গেছে। কারাকক্ষের দরজার দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল কুয়াশা। গেটের কাছে গিয়ে থামল সে। দুই হাত দিয়ে বালি সরিয়ে একটা গর্ত করল। আলখেল্লার পকেট থেকে ভারি, বড় একটা প্যাকেট বের করে সেই গর্তের ভিতর রাখল। দ্রুত বালি চাপা দিয়ে জায়গাটাকে সমতল করে ফেলল।

কারাকক্ষের সামনে থেকে ডায়মণ্ড খনির দিকে এগোতে লাগল কুয়াশা। খানিক দূর যাবার পর সে দেখল পাশাপাশি অনেকগুলো তলহীন খাঁচা দাঁড় করানো রয়েছে। একটা খাঁচায় প্রবেশ করল কুয়াশা। হাঁটল খানিকদূর। কোন অসুবিধাই অনুভব করল না সে।

পঞ্চাশটা খাঁচা, গুণে দেখল কুয়াশা। খাঁচাগুলোর কাছে আধঘন্টারও বেশি সময় কাটাল সে। তারপর পা বাড়াল।

এবার ফিরতে হয়।

শত্রুদের চোখে ধুলো দিয়ে নিরাপদে ফিরে এল কুয়াশা তার বন্ধু এবং সহকারীদের কাছে।

সকলের প্রশ্নের উত্তরে কুয়াশা বলল, 'সকাল হোক, নিজেরাই বুঝতে পারবে, কেন, কি করতে গিয়েছিলাম আমি।'

সাত

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা আক্রমণ করল।

কুয়াশার ডাকে সজাগ হয়ে উঠল সবাই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কামাল রিভলবার দিয়ে গুলি করল সামনের দিকে পর পর দু'বার।

শহীদ স্টেন নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাকি সবাই তৈরি।

হঠাৎ দেখা গেল শত্রুপক্ষকে। একজন দু'জন নয়, দল বেঁধে এগিয়ে আসছে তারা।

'ব্যাপার কি! প্রকাশ্যে এগিয়ে আসছে ওরা!'

সত্যিই তাই। গা-ঢাকা দেবার কোন চেষ্টাই করছে না শত্রুরা। সোজা হেঁটে আসছে তারা।

শহীদ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল।

'কুয়াশা! শয়তানরা মস্ত একটা কৌশল খাটিয়েছে! ওরা নয়, আসছে ক্রীতদাসের দল। বন্দিদেরকে সামনে রেখে পিছু পিছু আসছে ওরা। দেখতে পাচ্ছিস, কামাল? বন্দিদের প্রত্যেকের গলায় শিকল বাঁধা।'

'মাই গড! ডুশমনরা ভারি বুদ্ধি খাটাইয়াছে, স্বীকার করিটেই হইবে।'

রাসেল বলল, 'ওরা জানে বন্দিদের লক্ষ করে আমরা গুলি করব না; করলে নিরীহ একদল লোক মারা যাবে···।'

'এখন উপায়?'

কুয়াশাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছে। থমথমে গলায় বলল সে, 'কোন উপায় নেই। বন্দিদের কোন ক্ষতি করতে পারি না আমরা।'

এগিয়ে এসেছে দলটা। বন্দিদের পিছনে সশস্ত্র শত্রুপক্ষ। তাদের মধ্যে হাদি হুসেন আর উত্তাল চৌধুরীকেও দেখা যাচ্ছে।

বন্দিরা শারীরিক ভাবে ভীষণ দুর্বল। ধীরে ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসছে তারা। ভাবলেশহীন চেহারা তাদের। জীবন এবং মৃত্যু দুটোই যেন তাদের কাছে সমান। প্রতি মুহূর্তে পিঠে চাবুক খেয়েও তারা শান্ত থাকছে।

কুয়াশা এগিয়ে গেল সবাইকে পিছনে রেখে। খানিকটা এগিয়ে দুই কোমরে হাত দিয়ে বুক টান করে দাঁড়াল সে। চিৎকার করে জানতে চাইল, 'কি চাও তোমরা?'

ইতিমধ্যে কুয়াশাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে শত্রুপক্ষ। তাদের সামনের বন্দিরাও দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'ব্লু-বার্ডের যন্ত্রগুলো চাই! তোমরাই সরিয়েছ ওগুলো,' উত্তাল জবাব দিল।

কুয়াশা বলল, 'স্বীকার করছি, সরিয়েছি। কিন্তু ফিরিয়ে দেবার জন্য সরাইনি। হাজার চেষ্টা করলেও খুঁজে পাবে না তোমরা ওগুলো। ওগুলো ছাড়া ব্লু-বার্ড অচল। খাবার, পানি, কিছুই পাবে না তোমরা। না খেয়ে মরতে হবে তোমাদের।'

হাদি হুসেন আর উত্তাল অনেকক্ষণ ধরে নিচু গলায় কথা বলল নিজেদের মধ্যে।

তারপর উত্তাল বলল, 'আত্মসমর্পণ করো তোমরা। আমাদেরকে ফিরিয়ে দাও যন্ত্রাংশগুলো। তার বদলে, কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে হত্যা করব না আমরা। শুধু তাই নয়, এই দুর্গম জায়গা থেকে নিরাপদ লোকালয়ে রেখে আসব তোমাদেরকে।'

কুয়াশা অপ্রত্যাশিত ভাবে বলল, 'ঠিক আছে। প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখো। আমরা আত্মসমর্পণ করছি।'

কামাল অস্থির গলায় বলে উঠল, 'একি করলে তুমি, কুয়াশা! আত্মসমর্পণ করব! কিন্তু ওরা বেঈমান—প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কাজ করবে না···।'

কুয়াশা নিচু গলায় শুধু বলল, 'জানি। কিন্তু পার্টগুলো না পাওয়া অবধি ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সেগুলোর কথা এত তাড়াতাড়ি ওদেরকে বলছি না আমি।'

সশস্ত্র শত্রুপক্ষ ওদেরকে ঘিরে ফেলল। ওদের ব্যাগ-ব্যাগেজ দখল করল সব।

কড়া পাহারা দিয়ে নিয়ে গেল নিজেদের আস্তানার অভ্যন্তরে। শায়লা পারভিনকে নিয়ে চলে গেল হাদি হুসেন। একপ্রান্তের একটা জানালাহীন পাথরের কামরার ভিতর তাকে নিয়ে ঢুকল হাদি হুসেন। খানিক পর বাইরে বেরিয়ে এল সে। দরজাটা বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে।

কুয়াশা আর বাকি সবাইকে অন্য একটা পাথরের কামরায় ঢোকানো হলো। প্রত্যেকের গায়ের এবং পরনের কাপড় খুলে নিল শত্রুরা, বদলে পরতে দিল একখণ্ড চাদর। ওদের কাপড়-চোপড় সব পুড়িয়ে ফেলা হলো। ওদের ব্যাগ-ব্যাগেজগুলো নিয়ে চলে গেল উত্তালের নির্দেশে আফ্রিকান নিগ্রোরা। সেগুলো নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখা হলো তা জানার সুযোগ পেল না কেউ।

সাবান এবং পানি নিয়ে এল নিগ্রোর দল। স্নান করল ওরা। শুকনো রুটি এবং মধু এল প্রচুর।

পেট ভরে খেলো ওরা তাই।

ওদের খাওয়া শেষ হতে একসঙ্গে হাদি হুসেন আর উত্তাল প্রবেশ করল কামরার ভিতর।

'এবার বলো, কোথায় রেখেছ পার্টগুলো।'

হাসল কুয়াশা। বলল, 'এত সহজে? পার্টগুলো তোমাদেরকে দিলে তোমরা যদি আমাদেরকে মুক্তি না দাও? না, আমরা কোন ঝুঁকি নিতে রাজি নই। দুটো দিন সময় দাও আমাদের। আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখি কি পদ্ধতিতে তোমাদেরকে পার্টগুলো দিয়ে তার বদলে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারি।'

হাদি হুসেন দাঁতে দাঁত চাপল।

কিন্তু উত্তাল বলল, 'ঠিক আছে। তাই। কিন্তু বসে বসে খাবার আর পানি ধ্বংস করবে তা চলবে না। তোমাদেরকে কাজ করতে হবে খনিতে।'

'আপত্তি নেই। আমরা কাজেরই মানুষ,' বলল কুয়াশা।

খনির দিকে যাবার পথে দিনের আলোয় চারিটা দিক ভাল করে দেখে নেবার সুযোগ পেল ওরা।

রক্তচোষা বাদুড়ের খাঁচাগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় কুয়াশা জানতে চাইল, "আরও বাদুড় আছে নাকি তোমাদের?'

'আরও আছে মানে? অসংখ্য আছে!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল হাদি হুসেন।

খনিতে নামার অনেকগুলো পথ। সরু, ঢালু, বিপজ্জনক পথগুলো। নামার সময় ওরা একদিকের দেয়ালে বড় একটা গর্ত দেখল। সেই গর্তে আরও অনেক তারের খাঁচা রয়েছে। প্রতিটি খাঁচাতেই রয়েছে বাদুড়।

খনির নিচে নামল ওরা। আগে থেকেই কঙ্কালসার বন্দিরা মাটি কাটছিল। লোকগুলোর অবস্থা দেখে দুঃখে ভারি হয়ে উঠল ওদের সকলের বুক। মানুষের সব গুণ, সব উপলব্ধি, সব আবেগ-উত্তেজনা হারিয়ে ফেলেছে অভাগারা—এক একজন এক একটা যন্ত্রে পরিণত হয়েছে যেন।

কোদাল আর শাবল দেয়া হলো ওদেরকে। নীল রঙের মাটি কেটে বালতিতে ভরতে শুরু করল ওরা।

এই নীল মাটি সূর্যের তাপে শুকানো হয় প্রথমে। কয়েক হপ্তা ফেলে রাখা হয় উন্মুক্ত আকাশের নিচে—যতদিন না নীল মাটি শুকিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ওঠে। শুকনো-গুঁড়োগুলোকে এরপর ছিদ্র যুক্ত রিভলভিং পাত্রে তোলা হয়। ছাঁকাছাঁকির পর যা অবশিষ্ট থাকে সেগুলোকে পালসেটর মেশিনে ঢালা হয়।

খনির নিচে সারাটা দুপুর এবং বিকেল মাটি কাটল ওরা। বন্দিদের বিরুদ্ধে যে অকথ্য অত্যাচার চালানো হয় তার সামান্য নমুনা দেখেই আগুন জ্বলে উঠল ওদের প্রত্যেকের শরীরে। কিন্তু কেউ ব্যাপারটা নিয়ে কোন উচ্চ-বাচ্য করল না।

চারজন বন্দি চাবুকের আঘাত খেয়ে জ্ঞান হারাল। তাদের মধ্যে একজনের জ্ঞান ফিরল না। মারা গেছে সে।

মাঝে মাঝে উত্তালকে দেখল ওরা। তদারক করে গেল সে কয়েকবার।

কুয়াশার পাশে কয়েকজন বন্দি মাটি কাটছিল। আলাপ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সে। বোবা, মূক, বধির বলে মনে হলো লোকগুলোকে। কুয়াশার প্রশ্নের উত্তরে শ্বেতাঙ্গ বন্দিরা কোন কথাই বলল না।

বন্দিদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ অশ্বেতাঙ্গ সব ধরনের লোকই রয়েছে।

সন্ধ্যা নামল। কড়া পাহারা দিয়ে তুলে আনা হলো ওদেরকে।

পালসেটর মেশিনের কাছে একটা ট্রে-র উপর জমা করে রাখা হয়েছে সারাদিনের সঞ্চিত ডায়মণ্ড। পাশ ঘেঁষে যাবার সময় একজন প্রহরীর পায়ে ল্যাঙ মারল শহীদ।

আছাড় খেয়ে পড়ল প্রহরী। চারদিক থেকে ছুটে এল অন্যান্য প্রহরীরা। শহীদকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল একজন। শহীদ কনুই চালাল পিছন দিকে।

প্রচণ্ড ব্যথায় ককিয়ে উঠল লোকটা। ছেড়ে দিল সে শহীদকে। শহীদ যেন খেপে গেছে। লাফ দিয়ে ডায়মণ্ড ভর্তি ট্রে-এর কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও. মুঠো ভর্তি করে তুলে নিল ট্রে থেকে বেশ কয়েকটা ডায়মণ্ড, পরমুহূর্তে সেগুলো ছুঁড়ে দিল খনির ভিতরে।

ওর দেখাদেখি কামালও একই ধরনের পাগলামি শুরু করল।

ওদের দু'জনকে ঘিরে ফেলল প্রহরীরা। খুনের নেশা তাদের দুই চোখে। এমন সময় উত্তাল এল ছুটতে ছুটতে।

অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করল সে প্রহরীদের।

'গাধার বাচ্চারা! এরা আমাদের ব্লু-বার্ডের পার্ট লুকিয়ে রেখেছে, জানিস না? এদেরকে মেরে ফেললে সেগুলো ফিরে পাবার আর কোন আশাই থাকবে না···।'

কুয়াশা বলল, 'তোমাদের লোকদের এ ব্যাপারে পরিষ্কার জানিয়ে দাও, উত্তাল। আমি আবার তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমার দলের কারও গায়ে আঁচড়টি লাগলে আমি পার্টগুলো ফিরিয়ে দেব না!'

আট

নতুন একদল প্রহরী এল। উন্মুক্ত বেয়োনেটের মুখে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা। বিরাটাকৃতি কারাকক্ষের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওদেরকে।

যাবার পথে ওরা লক্ষ করল প্রহরী এবং অনুচরদল তন্ন তন্ন করে চারদিক খুঁজছে ব্লু-বার্ডের চুরি যাওয়া মেশিনারী পার্টস। এখানে-সেখানে অনেক গর্ত খোঁড়া হয়েছে, নতুন আরও অনেক গর্ত খোঁড়া হচ্ছে। যে জায়গায় পার্টগুলো লুকানো আছে সেই জায়গা বা তার আশপাশে সন্ধান নেয়নি বা নিচ্ছে না এখনও—লক্ষ করল কুয়াশা।

ব্লু-বার্ডের ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলো মেরামত করার কাজ অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। গম্বুজের উপর লোকজন চড়েছে মই বেয়ে। পরীক্ষা করে দেখছে কোথাও কোন ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে কিনা। কারাকক্ষটার চারদিকে দেয়াল বা পাঁচিল নেই, তার বদলে মোটা মোটা ইস্পাতের পিলার দাঁড়িয়ে আছে, একটার সঙ্গে অপরটার দূরত্ব মাত্র চার ইঞ্চি। পিলারগুলো তৈলাক্ত, পিচ্ছিল। সোজা উঠে গেছে আকাশের দিকে। পাঁচ-ছয় মানুষ উঁচু। প্রত্যেকটির মাথা ছুঁচাল।

কারাকক্ষের ভিতরেও এখানে সেখানে অনেকগুলো পিলার রয়েছে। সেগুলো তেমন উঁচু নয়। এই পিলারগুলোর সঙ্গে লোহার শিকল বাঁধা। সেই শিকলের সঙ্গে বাঁধা দশ বারোজন করে হাড্ডিসার মৃতপ্রায় লোক।

কুয়াশাকে একটি পিলারের সঙ্গে বাঁধা হলো। তার কোমরে জড়িয়ে দেয়া হলো লোহার শিকল। শিকলটা খুবই ছোট। বসার কোন উপায় নেই। দাঁড়িয়ে থাকতে সে বাধ্য। শুধু কুয়াশার জন্য নয়, এই একই ব্যবস্থা বাকি সকলের জন্যও।

ডি. কস্টা দূরের একটি পিলারের কাছ থেকে বলল, 'ভেরি ব্যাড, ইনডীড। খোদ শয়টানের চেলা এনিমিরা। মি. কামাল, হামরা যখন মুক্ত হইব টখন এনিমিডেরকে কি রকম শাস্তি ডিটে হইবে টাহা চিন্তা করিয়া বাহির করুন, প্লীজ!'

কামাল বলল, 'চুপ করুন। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করছি।'

রাসেল বলে উঠল কারাকক্ষের দূর প্রান্ত থেকে, 'ঘুমোবার চেষ্টা করছেন! সেকি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?'

ডি. কস্টা বলল, 'দ্যাটস্ ইমপসিবল!'

কামাল বলল, 'যখন যা অবস্থা। বাস্তবকে মেনে নেয়া দরকার। ঘুম না হলে দুর্বল হয়ে পড়ব, তা আমি চাই না।'

হঠাৎ সবাই চুপ করল।

কুয়াশার গলা শোনা যাচ্ছে। কার সঙ্গে যেন কথা বলছে সে।

কুয়াশা তার পাশের একজন বন্দির সঙ্গে আলাপ করছিল। 'কখনও পালাবার চেষ্টা করোনি এখান থেকে?'

বন্দি লোকটা বলল, 'না। পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। যারা সে চেষ্টা করেছে তাদের কপালে কি ঘটেছে তা আমরা সবাই জানি।'

বন্দি লোকটা ভাল উর্দু বলতে পারে। সে মিশরের লোক।

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'কি ঘটেছে তাদের কপালে?'

'তারা সবাই মারা গেছে। কেউ মরেছে বাদুড়ের কামড় খেয়ে—কেউ মরেছে জঙ্গলে সাপের কামড়ে বা মানুষখেকো গাছের কবলে পড়ে। ওই জঙ্গলে—ওটার ভিতর কেউ ঢুকে আজ পর্যন্ত বেরুতে পারেনি।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু পালানো একেবারে অসম্ভব কি? শায়লা পারভিন এবং

তার দুই সাথী···।'

বন্দি লোকটা বলল, 'মিস শায়লাকে ওরা সন্দেহ করত না। সেজন্যেই ওরা পালাবার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছে ভেবে দেখুন। মিস শায়লাকে ফিরিয়ে এনেছে ওরা। তার সাথীদেরকে খুন করেছে···।'

'আপনারা এখানে মোট কতজন আছেন?'

'দুই শত এগারো জন।'

আরও কিছু প্রশ্ন করল কুয়াশা। বন্দি লোকটি খানিক পর বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বলল, 'এত কথা জানতে চাইছেন কেন? জেনে কি লাভ? ভেবেছেন পালাতে পারবেন ওদের হাত থেকে? তা যদি ভেবে থাকেন, তাহলে বলব আপনি এখনও বিপদের গুরত্ব টের পাননি। ধরে নিন, আপনি শেষ হয়ে গেছেন, মারা গেছেন। ওদের হাতে বন্দি আপনি, চিরকাল এই বন্দি হয়েই থাকতে হবে।'

কুয়াশা লোকটার কথার উপর কিছুই বলল না।

চাঁদ বা নক্ষত্র—কিছুই নেই আকাশে। ঘুটঘুটে অন্ধকার চারদিকে। ঢং ঢং করে দুটো ঘন্টা পড়ল।

রাত দুটো।

মাঝে মাঝে প্রহরীদের পদশব্দ ভেসে আসছে কারাকক্ষের বাইরে থেকে। কখনও কখনও টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে—আলো নিভে যাচ্ছে।

মৃদু কণ্ঠে কুয়াশা বলল, 'শহীদ।'

শহীদ অন্ধকার থেকে শুধু বলল, 'ইয়েস।'

পরনের চাদরের এক কোণায় গিট বাঁধা, সেটা খুলল শহীদ। বেরিয়ে এল একটুকরো ডায়মণ্ড।

খনির উপর উঠে ট্রে থেকে ডায়মণ্ডের টুকরোগুলো নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করার সময় একটা করে টুকরো লুকিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দিয়েছিল শহীদ এবং কুয়াশা। শত্রুদেরকে বোকা বানিয়ে ডায়মণ্ডের টুকরো সংগ্রহ করাই ছিল তখনকার উদ্ভট আচরণের একমাত্র কারণ।

কুয়াশার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে শহীদ ডায়মণ্ডের টুকরো দিয়ে কেটে ফেলল শিকল। নিজেকে মুক্ত করে এগিয়ে গেল সে কামালের দিকে। অস্ফুটে ডাকল, 'কোথায় তুই, কামাল?'

কামাল সাড়া দিল, 'এইদিকে!'

এদিকে কুয়াশাও নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে। রাজকুমারী ওমেনাকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে সে।

মিনিট বিশেকের মধ্যে সকলকেই মুক্ত করল ওরা।

'যা করার দ্রুত করতে হবে আমাদের। প্রহরীরা যে কোন মুহূর্তে ঢুকতে পারে ভিতরে চেক করার জন্য। কুয়াশা, পিরামিড তৈরি করি আমরা, কেমন?'

শহীদের প্রশ্নের উত্তরে কুয়াশা বলল, 'একটু পর। আমার যন্ত্রপাতির প্যাকেটটা বের করি আগে।'

অন্ধকারে পা ফেলে ফেলে কারাকক্ষের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা।

চিন্তা করল একমুহূর্ত। জায়গাটা কোথায় তা অনুমান করে এগিয়ে গেল ডান পাশে খানিকটা। তারপর হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল।

একটি হাত বাইরে বের করে মাটি খুঁড়তে শুরু করল কুয়াশা। কয়েকমুহূর্ত পর প্যাকেটটা ঠেকল হাতে।

ফিরে এল কুয়াশা। চাপা কণ্ঠে বলল, 'প্রহরীটা গেটের খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।'

কথাগুলো বলে কুয়াশা গেটের কাছে ফিরে গেল নিঃশব্দে।

মিনিট তিনেক পর কুয়াশার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এসো!'

গেটের সামনে ওরা পরস্পরের কাঁধে উঠে দাঁড়াল। সকলের উপর দাঁড়াল ডি. কস্টা।

কুয়াশা ওদের শরীরের উপর দিয়ে উঠে গেল, দাঁড়াল ডি. কস্টার কাঁধে।

চাপা, যন্ত্রণাক্ত কণ্ঠে অভিযোগ করল ডি-কস্টা, 'গোটা ডুনিয়াটা হামার উপর চাপাইয়া ডেয়া হইয়াছে বলিয়া মনে হইটেছে। যডি সেন্সলেস হইয়া যাই হামার কোন দোষ নাই—।'

হঠাৎ ডি. কস্টা অনুভব করল তার কাঁধে কুয়াশা নেই।

পিলার ধরে উঠে গেছে উপরে কুয়াশা, ডিগবাজি খেয়ে অতিক্রম করেছে সে পিলারের ছুঁচাল মাথাগুলো।

পিলারগুলো টপকে গিয়ে তরতর করে নেমে পড়ল কুয়াশা কারাকক্ষের বাইরের প্রাঙ্গণে।

টহলদানরত প্রহরীটা এগিয়ে আসছে।

দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে দেখে ফেলার আশঙ্কা, নিঃশব্দে শুয়ে পড়ল কুয়াশা।

প্রহরী বেশ খানিকটা দূর দিয়ে চলে গেল। চারকোনা কারাকক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সে। গেটের পাশ দিয়ে প্রতি তিন মিনিটে একবার করে হেঁটে যাচ্ছে।

প্রহরী অদৃশ্য হয়ে যেতে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। অন্ধকারে কিছু দেখা না গেলেও মানুষ সমান উঁচু মাচাটা কোন্ দিকে তা অনুমান করে সন্তর্পণে পা বাড়াল সে। কয়েক গজ এগিয়েই থামল। মাচার সামনে পৌঁছে গেছে সে।

মাচার উপর পাশাপাশি সাজানো রয়েছে লোহার শিকের খাঁচাগুলো।

খাঁচাগুলোর খুব একটা কাছাকাছি এগোল না কুয়াশা। হাতের প্যাকেটটা খুলল সে। বের করল একটা বড়সড় বোতল, খানিকটা তুলো এবং সিগারেটের মত ছোট একটা পেন্সিল টর্চ।

বোতলের ক্লোরোফর্ম দিয়ে তুলোর খানিকটা ভিজিয়ে নিল কুয়াশা। তারপর ইনফ্রা-রেড আলো নিক্ষেপক ছোট্ট পেন্সিল টর্চটা জ্বালল। প্যাকেট থেকে বের করে চশমা জোড়া আগেই সে পরে নিয়েছে।

মৃদু আলোয় কুয়াশা দেখল বাদুড়গুলো সতর্ক, সন্দিহান হয়ে উঠেছে। একটি খাঁচার ভিতর ক্লোরোফর্ম ভেজানো তুলোর টুকরোটা ঢুকিয়ে দিল কুয়াশা। খাঁচার বাদুড়টা তুলোটাকে জীবন্ত কিছু মনে করে ঠোকর মারল ঠোঁট দিয়ে পর পর দু'বার। তৃতীয়বার ঠোকর মারতে গিয়েও পারল না সে, ঢলে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে।

আঙুল দিয়ে খাঁচার ভিতর থেকে ভিজে তুলোটা বের করে নিল কুয়াশা।

পাশের খাঁচার ভিতর সেটাকে ঢুকিয়ে দিল এবার। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। দ্বিতীয় খাঁচার রক্তশোষক বাদুড়টিও জ্ঞান হারাল।

এইভাবে একের পর এক খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ক্লোরোফর্মে ভেজানো তুলো ব্যবহার করে ভ্যাম্পায়ারগুলোকে সাময়িক ভাবে অজ্ঞান করে দিল কুয়াশা।

শান্ত কিন্তু দ্রুত নিজের কাজ করে চলেছে কুয়াশা। মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলেও কাজের মধ্যে তার কোন প্রকাশ দেখা গেল না। খাঁচার সংখ্যা একটা দুটো নয়—অসংখ্য। প্রচুর সময় লাগছে। যত দেরি হচ্ছে ততই ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা করে বাড়ছে।

অবশেষে কাজটা শেষ হলো। এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটল সে খনির দিকে।

খনির মুখে দুইজন স্টেনগানধারী প্রহরীকে দেখা গেল। সন্তর্পণে এগোল কুয়াশা। লোক দু'জন উঁচু একটা পাথরের উপর বসে গল্প করছে। ইনফ্রা-রেড পেন্সিল টর্চের মৃদু আলোয় ওদেরকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। নিঃশব্দ পায়ে লোক দু'জনের ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল সে। দুই হাত দিয়ে দু'জনের মাথা ধরে আচমকা ঠুকে দিল সে সজোরে।

দুই মাথা জোরে ঠোকর খেলো—সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল লোক দু'জন।

খনির ভিতর নামতে শুরু করল কুয়াশা। খানিক দূর নেমেই প্রকাণ্ড একটা গহ্বর দেখল সে একপাশে। লাফ দিয়ে সেই গহ্বরের ভিতর ঢুকল। অসংখ্য খাঁচা রয়েছে পাশাপাশি। ক্লোরোফর্মে ভেজানো তুলো ব্যবহার করতে শুরু করল আবার কুয়াশা।

আধঘণ্টা পর খনির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সে। দ্রুত পায়ে ফাঁকা উঠানটা পেরিয়ে একটা পাথরের তৈরি কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজাটার গায়ে হাত দিতেই সেটা খুলে গেল। অবাক হলো কুয়াশা দরজাটা খোলা দেখে।

ভিতরে ঢুকল না সে। ঢোকার আগে জেনে নিতে হবে ভিতরে প্রহরীরা কেউ আছে কিনা। এই কামরায় শায়লাকে ঢোকানো হয়েছিল, দেখে রেখেছিল সে। কিন্তু দরজাটা খোলা কেন?

কামরার ভিতর থেকে কাঁপা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'কে ওখানে!' শায়লার গলা। গলাটা চিনতে পেরেই দরজা পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল কুয়াশা। দরজাটা ভিজিয়ে দিল। শায়লা তাকে দেখতে না পেলেও সে শায়লাকে দেখতে পাচ্ছিল ইনফ্রা-রেড পেন্সিল টর্চের আলোয়।

'দরজাটা খোলা কেন?'

'একজন প্রহরী দু'মিনিট পর পর আসে, উঁকি মেরে দেখে যায় আমাকে···।'

কুয়াশা শায়লার কোমরে জড়ানো শিকল ডায়মণ্ডের টুকরো দিয়ে কাটতে কাটতে বলল, 'বুঝেছি।'

শিকলটা কাটা হতেই দরজার কাছে টর্চের আলো পড়ল। ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা ঢুকল কামরার ভিতর।

আঁতকে উঠল শায়লা পারভিন, 'প্রহরীটা ফিরে আসছে। কি হবে!'

লাফ দিয়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। পরমুহূর্তে সশব্দে খুলে গেল

কবাট দুটো।

বিদ্যুৎবেগে ঘুসি চালাল কুয়াশা। প্রহরীর নাকে গিয়ে লাগল ঘুসিটা। বিশ্রী একটা শব্দ হলো। থ্যাচ করে ভেঙে গেল নাকটা।

প্রহরীর অচেতন দেহটা সশব্দে ধরাশায়ী হলো।

কুয়াশা বলল, 'শায়লা, তুমি এখানেই অপেক্ষা করো। খানিক পরই শোরগোলের শব্দ পাবে। দেরি না করে এখান থেকে বেরিয়ে ছুটবে তুমি ব্লু-বার্ডের দিকে। ভুল কোরো না।'

কথাগুলো বলেই বেরিয়ে পড়ল কুয়াশা।

ফাঁকা উঠানের মাঝখান দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে কুয়াশা, সোজা কারাকক্ষের দিকে যাচ্ছে সে। আচমকা দুটো টর্চের আলো জ্বলে উঠল।

আলোকিত হয়ে উঠল কুয়াশার শরীর।

'কে! ইয়াল্লা…'

'ইয়াল্লা!'

পরমুহূর্তে গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

ডাইভ দিয়ে সরে গেছে কুয়াশা ইতিমধ্যে, বালির উপর শুয়ে পড়েছে সে। প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এসেছে তার হাতে ছোট আকারের একটি রিভলবার।

রাইফেলের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই গর্জে উঠল কুয়াশার হাতের রিভলবার।

নিভে গেল একটি টর্চ।

অপর টর্চটি নিভে গেছে আগেই। কিন্তু সেদিক থেকে ভেসে আসছে ধস্তাধস্তির শব্দ।

হঠাৎ শোনা গেল শায়লা পারভিনের আর্ত চিৎকার! 'বাঁচাও!'

ছুটল কুয়াশা। কয়েক গজ এগিয়েই সে দেখল শায়লার দেহের উপর একটা পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে একজন প্রহরী। তার হাতের রাইফেলের ডগায় ফিট করা বেয়োনেটটা শায়লার বুক বরাবর খাড়া নেমে আসছে।

গুলি করল কুয়াশা।

প্রহরীটা টলে উঠল। পড়ে গেল সশব্দে বালির উপর শায়লা পারভিনের পাশে।

শায়লা পারভিন তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কুয়াশা তার একটা হাত ধরে ছুটল কারাকক্ষের দিকে, চাপা কণ্ঠে বলল, 'আমার পিছু পিছু আসছিলে বুঝি?'

'হ্যাঁ। কাজটা কিন্তু খারাপ করিনি। লোকটা আপনাকে গুলি করছে দেখে পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম আমি। হাত কেঁপে গিয়েছিল বলে গুলি লাগেনি আপনার…।'

'ধন্যবাদ!'

এদিকে শোরগোল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। ব্যাপারটা কি জানার চেষ্টা করছে শত্রুরা। প্রহরীরা টর্চ জেলে ছুটোছুটি করছে।

কারাকক্ষের গেটের সামনে পৌঁছুল ওরা।

'শহীদ!'

কুয়াশার গলা শুনে শহীদ গেটের ওপার থেকে বলে উঠল, 'সব বন্দিকে মুক্ত

করেছি। এখন শুধু গেটটা খুললেই হয়। কি করতে হবে বলেছি সবাইকে···।'

রিভলবার ব্যবহার করল কুয়াশা। এখন আর নিঃশব্দে কাজ করে কোন লাভ হবে না।

গেটের তালা ভেঙে গেল।

গেট খুলে বেরিয়ে এল শহীদ, কামাল, ওমেনা, ডি. কস্টা, রাসেল। তাদের পিছু পিছু কঙ্কালসার বন্দিরাও বেরুল। শহীদের হাতে নিজের একমাত্র রিভলবারটা ধরিয়ে দিয়ে বলল কুয়াশা, 'ব্লু-বার্ডের দিকে সবাইকে নিয়ে এগোও!'

সামনে শহীদ এবং রাজকুমারী। বন্দিরা ভয়ে ভয়ে পা বাড়াল। সকলের পিছনে কামাল, রাসেল, ডি. কস্টা এবং শায়লা পারভিন।

কুয়াশা চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেছে কোন্ দিকে যেন।

অন্ধকারে ছুটছে কুয়াশা। টর্চ জ্বলছে এদিক-ওদিক থেকে। কাছাকাছি এক জায়গা থেকে একটা টর্চ জ্বলে উঠেই নিভে গেল। ছুটতে শুরু করল কুয়াশা সেদিকে।

শত্রুপক্ষ এখনও সঠিক ঠাহর করতে পারেনি কোথায় কি ঘটেছে। প্রহরীরা সংখ্যায় দশ বারোজন হবে। তারা বিশৃংখল ভাবে ছুটোছুটি করছে শুধু।

চার হাত দূর থেকে একজন প্রহরীর উপর লাফিয়ে পড়ল কুয়াশা। লোকটাকে নিয়ে বালির উপর পড়ল সে। ঘুসিটা কপালের ডান দিকে লেগেছে, জ্ঞান হারিয়েছে সে সঙ্গে সঙ্গেই। উঠে দাঁড়াল কুয়াশা প্রহরীর রাইফেলটা নিয়ে। অদূরে আরও একজন প্রহরী, টর্চের আলো ফেলল সে কুয়াশার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল কুয়াশার হাতের রাইফেল।

আর্তচিৎকারে কেঁপে উঠল চারদিক।

ছুটল কুয়াশা। আহত প্রহরীর রাইফেলটা সংগ্রহ করল সে। দুটো রাইফেল হলো। আবার টর্চের আলো দেখে গুলি করল সে।

মিনিট পাঁচেক পর শহীদ হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আচমকা আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।

শত্রুপক্ষ সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠেছে এতক্ষণে।

প্রমাদ গুণল শহীদ। একটা রিভলবার মাত্র সম্বল তাদের। শত্রুপক্ষ সবাই সশস্ত্র। তবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে মরতে হবে বোকার মত। অদূরের বৈদ্যুতিক বাল্‌ব লক্ষ্য করে গুলি করল সে।

অব্যর্থ লক্ষ্য। চুরমার হয়ে গেল বালবটা।

চমকে উঠল শহীদ ওর পাশ থেকে একটি রাইফেল গর্জে উঠতে শুনে। ঝট্ করে তাকাল সে। কামালের হাতে একটি রাইফেল দেখে আরও অবাক হলো ও।

'কুয়াশা দিয়ে গেল।'

কথাটা বলেই কামাল গুলি করল। দ্বিতীয় একটা বালব নিভে গেল পরমুহূর্তে।

চারদিক থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হলো। বালবের সংখ্যা একে একে কমছে।

সকলের পিছন থেকে রাজকুমারী, রাসেল এবং ডি. কস্টাও রাইফেলের গুলি ছুঁড়ছে। কুয়াশা ওদেরকেও দিয়ে গেছে একটা করে রাইফেল।

বন্দিরা হতভম্ব হয়ে পড়েছে। শহীদ এবং কামাল একটু একটু করে এগোলেও,

সবাই তাদেরকে অনুসরণ করছে না। কেউ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে, কেউ পিছু হটছে।

কুয়াশা দলের সঙ্গেই রয়েছে। কঙ্কালসার মানুষগুলোকে আশ্বাস দিচ্ছে সে, দলের সঙ্গে থাকার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে, সেই সঙ্গে শত্রুনিধনের জন্য রাইফেলের গুলি ছুঁড়ছে এদিক-সেদিক। ব্লু-বার্ডের দিকে এগোচ্ছে গোটা দলটা।

চারদিক থেকে এলোপাতাড়ি গুলি হচ্ছে। কঙ্কালসার লোকগুলোর মাঝখানে এসে পড়ছে দু'একটা বুলেট।

আর্তচিৎকার, কাতরানি, গোঙানি—কান পাতা দায়। এমন সময়, সব শব্দকে ছাপিয়ে লাউডস্পিকারে ভেসে এল উত্তালের কণ্ঠস্বর, 'শয়তান কুয়াশা! ভেবেছ প্রহরীদেরকে হত্যা করে কয়েকটা রাইফেল যোগাড় করতে পারলেই মুক্তি পাবে! বোকা—তুমি একটা আস্ত বোকা! আমাদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া তোমাদের কারও পক্ষে কোন কালে সম্ভব নয়। এখনও সময় আছে—শেষবারের মত সুযোগ দিয়ে বলছি তোমাকে—আত্মসমর্পণ করো! তা না হলে আমরা আমাদের চরম অস্ত্র ব্যবহার করব।'

উত্তালের কথা শেষ হতেই গর্জে উঠল কুয়াশার রাইফেল। সেই সঙ্গে গুলি ছুড়লো শহীদ, কামাল, রাজকুমারী, ডি. কস্টা, রাসেল—ওরা সবাই।

কুয়াশা বলছে, 'জলদি! জলদি! কেউ পিছিয়ে পোড়ো না! পিছিয়ে পড়া মানেই মৃত্যু। ব্লু-বার্ডে গিয়ে উঠতেই হবে আমাদের। ওখানে একবার পৌঁছুতে পারলেই হলো—বেঁচে যাব সবাই। জলদি! এগোও সবাই!'

গোটা দলটা হঠাৎ যেন গতি লাভ করল নতুন করে। সবাই ছুটছে দল বেঁধে, দ্রুত বেগে।

শত্রুপক্ষ পিছিয়ে গেল টিকতে না পেরে। সামনের পথ ফাঁকা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ব্লু-বার্ডের সামনে পৌঁছে গেল গোটা দলটা।

শহীদ থমকে দাঁড়িয়েছে। লূ-হাওয়ার মত ছুটে এসে থামল ওর সামনে কুয়াশা।

শহীদের কণ্ঠস্বর কাঁপছে, 'ব্যাপার কি! শত্রুরা গেল কোথায়? হঠাৎ চুপ মেরে গেছে ওরা—কেন?'

কুয়াশা কপালের ঘাম হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছতে মুছতে দ্রুত বলল, 'চরম অস্ত্র ব্যবহার করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা! শহীদ, সবাইকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্লু-বার্ডের ভিতরে ওঠাতে হবে!'

সবাই কঙ্কালসার মানুষগুলোকে সুশৃংখল ভাবে ব্লু-বার্ডে ওঠাবার কাজে লেগে গেল।

এমন সময় শোনা গেল ঘণ্টাধ্বনির শব্দ।

চারদিক থেকে ভেসে আসছে সেই শব্দ!

'ভ্যাম্পায়ারদের খাঁচা থেকে ছাড়বে এবার ওরা!' কুয়াশা বলল, 'নিজেদের লোককে খাঁচার ভিতর আশ্রয় নিতে বলছে হাদি হুসেন এবং উত্তাল ঘণ্টা বাজিয়ে।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠছে কঙ্কালসার মানুষগুলো।

কুয়াশা নিজের কাজে ব্যস্ত। রাইফেল উঁচিয়ে গুলি করছে সে এদিক-সেদিক। একটার পর একটা বালব চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে গোটা জায়গাটা।

ঘন্টাধ্বনি থামল খানিক পরই। কুয়াশা ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ব্লু-বার্ডের সিঁড়ি বেয়ে প্রায় সব লোকই উঠে গেছে।

চিন্তা করতে দেখা গেল কুয়াশাকে।

বাদুড়গুলোর জ্ঞান কি ফিরে এসেছে ইতিমধ্যে?

শহীদ সিঁড়ির মাথা থেকে ডাকল, 'চলে এসো, কুয়াশা।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল কুয়াশা। সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'সবাইকে বলে দাও কোন জানালা, পোর্ট, গর্ত, ভেন্টিলেটর যেন খোলা না থাকে। প্রতিটি জানালা পরীক্ষা করতে হবে।'

ভিতরে ঢুকল ওরা দরজা পেরিয়ে। বন্ধ করে দিল দরজা। শহীদ, কামাল, রাসেল, ওমেনা এবং ডি. কস্টাকে পাঠিয়ে দিল দরজা জানালা ইত্যাদি পরীক্ষা করার জন্য।

নিস্তব্ধতা অটুট হয়ে রয়েছে।

কোথাও কোন শব্দ নেই।

ভয়ে এখনও জড়সড় হয়ে রয়েছে কঙ্কালসার মানুষগুলো। এখনও তারা বিশ্বাস করতে পারছে না যে শেষ পর্যন্ত তারা মুক্ত হতে পারবে। রক্তচোষা বাদুড়—এদের হাত থেকে মুক্তি নেই, তাদের বদ্ধমূল ধারণা।

জানালা, দরজা, গর্ত, ভেন্টিলেটর সব বন্ধ করে দেয়া হলো। কঙ্কালসার মানুষগুলোকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক একটা কেবিনে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

সবাই ফিরে এসেছে কুয়াশা এবং শহীদের কাছে।

কোথাও কোন শব্দ নেই।

শায়লা পারভিন জানতে চাইল, 'কি ঘটছে বাইরে? কোন শব্দ নেই—শত্রুরা করছে কি?'

কুয়াশাকে কেমন যেন ম্লান দেখাচ্ছে। যেন কোন ব্যাপারে দুঃখ বোধ করছে সে।

শায়লা পারভিন আবার বলল, 'আপনার হয়েছে কি? কথা বলছেন না কেন। মন খারাপ করে চুপচাপ···।'

কামাল বলল, 'ব্যাপার কি, কুয়াশা? মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটার জন্য অপেক্ষা করছ যেন তুমি?'

কুয়াশা ভারি কণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ। অপেক্ষা করছি। নাটকের শেষদৃশ্যের জন্য অপেক্ষা করছি। দৃশ্যটা খুবই মর্মান্তিক তাই খারাপ লাগছে। তবে, এছাড়া করার কিছু ছিলও না আর।'

'তারমানে!' কামাল জানতে চাইল।

এমন সময় আর্তনাদ ভেসে এল বাইরে থেকে। প্রথমে একজন লোক চিৎকার

করে উঠল। তারপর একযোগে বহু লোক।

'কি হলো?'

ওমেনা উত্তেজিতভাবে জানতে চাইল!

শহীদ বলল, 'জানালাটা একটু ফাঁক করে দেখলে হয়···।'

'দেখতে চাও? কিন্তু না দেখাই ভাল।'

জানালাটা খুলল শহীদ।

কুয়াশা হাত উঁচু করে সুইচবোর্ডের একটা সুইচ চেপে ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে ফ্লাডলাইটের উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল বাইরেটা।

জানালার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সবাই।

সত্যিই দৃশ্যটা মর্মান্তিক।

সকলে দেখল তলহীন যে সব খাঁচার ভিতরে শত্রুপক্ষের লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল সেগুলো ভেঙে পড়েছে অজ্ঞাত কোন কারণে!

রক্তচোষা বাদুড়ের দল গোটা এলাকার উপর ঘুরছে। দল-বেঁধে নেমে আসছে তারা লোকগুলোর উপর।

মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে শত্রুপক্ষের লোকেরা। মৃত্যুভয়ে ছুটোছুটি করছে তারা অন্ধের মত।

কিন্তু রেহাই নেই কারও। রক্তচোষা ভ্যাম্পায়ারের দল কাউকে নিষ্কৃতি দিচ্ছে না।

'কী সাংঘাতিক!'

শহীদ নিস্তব্ধতা ভাঙল।

কামাল জানতে চাইল, 'কিন্তু খাঁচাগুলো ভেঙে পড়ল কিভাবে?'

কুয়াশা বলল, 'প্রতিটি খাঁচার জয়েন্টে অ্যাসিড ছিটিয়ে দিয়ে এসেছিলাম, নাড়াচাড়া করতে ভেঙে গেছে সব।'

লোমহর্ষক কাণ্ডটা দেখতে দেখতে থামল। শত্রুপক্ষের একজনকেও রেহাই দেয়নি বাদুড়ের দল।

'হাদি হুসেন আর উত্তাল—ওরা পালিয়েছে।' নিস্তব্ধতা ভাঙল রাসেল।

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। পালিয়েছে। পৃথিবী থেকে পালিয়েছে শয়তান দুটো। ওই যে, ডান দিকের লাইট পোস্টটার দিকে তাকাও, ওদের লাশ দুটো পড়ে রয়েছে।'

সবাই তাকাল সেদিকে।

—

কুয়াশা ৫৭

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ১৯৭৬

এক

দেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত টেকনাফ। ছোট্ট শহর। টেকনাফের পুবে নাফ নদী। পশ্চিমে উত্তাল বঙ্গোপসাগর।

আবদুল্লা এমাম রাউ এই টেকনাফের লোক।

এমাম রাউ লোকটা একটু খাপছাড়া ধরনের। একটু-আধটু লেখাপড়া জানে সে। শীতকালে টুরিস্টদের সাহায্য করে বেশ দু'পয়সা কামায়। বছরের বাকি সময়টা সে মাছ ধরে। একা লোক, সংসারধর্ম নেই—অভাব নেই কোন। কিন্তু অভাব না থাকলে কি হবে, এমাম রাউয়ের একটা খারাপ স্বভাব আছে। লোভ সামলাতে পারে না লোকটা। সুযোগ পেলেই চুরি করে। জিনিসটা কম দামী হোক বা বেশি দামী হোক, হালকা হোক বা ভারি হোক—সুযোগ পেলেই চুরি করবে সে ঠিক।

চোর হলেও, রাউ কিন্তু পাকা চোর। চুরি করে আজ অবধি ধরা পড়েনি সে। কেউ তাকে চোর বলে ভাবতেই পারে না।

রাউ তেমন মিশুক লোক নয়। লোকজন সে পছন্দ করে না। জঙ্গলের ধারে, পাহাড়ের পাদদেশে ছোট্ট একটা দুই চালার নিচে সে থাকে। কাছে পিঠে আর কোন বাড়ি ঘর নেই। সবচেয়ে কাছের বাড়িটাও প্রায় আধ মাইল দূরে। সে বাড়ির মালিক ইউনুস আদাং।

রাউ যাচ্ছিল ইউনুস আদাঙের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য। চলতি মউসুমে মাছ ধরার কাজটায় সুবিধে করা যাচ্ছে না। রাউয়ের ইচ্ছা ইউনুসের মত গো-সাপের চামড়ার ব্যবসা করবে সে-ও। এ ব্যাপারেই ইউনুসের সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছে।

ইউনুস আদাং ভিন গাঁয়ের লোক। এই এলাকায় একা পড়ে আছে সে ব্যবসার কারণে। উপজাতীয়দের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে গো-সাপের চামড়া কিনে দূরাঞ্চলের শহরে পাঠায় সে। এতে তার ভাল লাভ হয়।

রাউ নিরাশ হলো। ইউনুসের দো-চালার সামনে মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। ঘরের দরজা বন্ধ। তালা ঝুলছে। ইউনুস আদাং বাড়িতে নেই।

ঘরের তালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দুষ্ট বুদ্ধি চাপল হঠাৎ রাউয়ের মাথায়। এর আগে ইউনুসের ঘরের ভিতর ঢোকেনি সে। ইউনুস ভাল রুজি-রোজগার করে। তার ঘরের ভিতর নিশ্চয়ই দামী দামী নানা রকম জিনিসপত্র আছে। তালা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখলে হয় কি কি আছে। তালা খোলাটা খুব একটা

সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। এই রকম তালা তার ঘরেও আছে।

যেই ভাবা সেই কাজ। পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুলে ভিতরে ঢুকল রাউ। ঘরের ভিতর ঢুকে নিরাশই হলো সে। দামী জিনিস বলতে কিছুই দেখতে পেল না। তবে দুই ব্যাগ ভর্তি গো-সাপের চামড়া রয়েছে। কি আর করা, খালি হাতে তো আর বিদায় নেয়া যায় না—রাউ ব্যাগ দুটো দুই হাতে ঝুলিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। এই যে চুরি—এটাই হলো তার কাল। আসলে চুরি করে মৃত্যুর দিকে এক পা এগোল রাউ।

হাঁটা পথ ধরে সোজা শহরে পৌঁছুল রাউ। গো-সাপের দাম সম্পর্কে তার ধারণা ছিল না। শহরের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে চিনত সে। তারা তার কাছ থেকে চোরাই মাল কেনে মাঝে-মধ্যে। রাউ তাদের একজনের কাছে গিয়ে গো-সাপের চামড়ার দাম জানতে চাইল।

আশার চেয়ে সাতগুণ বেশি দাম পেল রাউ। আনন্দে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে পড়ল সে। এত টাকা এক সঙ্গে এর আগে রোজগার করেনি। রাউ জীবনে এই প্রথম সিদ্ধান্ত নিল—কিছু টাকা সে আনন্দ করার জন্য খরচ করবে। তার এই সিদ্ধান্ত—মৃত্যুর দিকে এটা তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ।

শহরে মিরাকল সার্কাস পার্টি এসেছে। নানারকম চমকপ্রদ শারীরিক কসরত, ট্রেনিংপ্রাপ্ত জীব-জন্তুদের আশ্চর্য ধরনের খেলা দেখানো হচ্ছে। রাউ টিকেট কেটে ঢুকে পড়ল মিরাকল সার্কাস পার্টির ছাউনিতে। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক পা এগিয়ে গেল রাউ নিজের মৃত্যুর দিকে।

ছাউনিতে ঢোকার পর থমকে দাঁড়াল রাউ। চারদিকে হইচই, চিৎকার, শোরগোল। এখানে সেখানে বড় বড় তাঁবু ফেলা রয়েছে। তাঁবুর সামনে খুব ভিড়। প্রত্যেকটি তাঁবুর সামনে একটা করে টুল। সেই টুলের উপর দাঁড়িয়ে টিনের চোঙ মুখে ঠেকিয়ে ঘোষকরা ঘোষণা প্রচার করছে।

রাউ দেখল একটি তাঁবুর সামনে একটা প্রকাণ্ড টেবিল রয়েছে। টেবিলের উপর তিনটে বনমানুষ। তাদের পায়ে লোহার শিকল। সেদিকে এগিয়ে গেল রাউ। ভিড় ঠেলে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে বনমানুষ তিনটের সামনে। নিজের অজ্ঞাতে মৃত্যুর দিকে আরও এক পা এগোল রাউ।

ঘোষক টিনের চোঙ মুখের সামনে তুলে ধরে ঘোষণা করছিল:

'ভাই সকল! ভাই সকল দেখে যান! দেখে যান আফ্রিকার গহীন জঙ্গল থেকে ধরে আনা নরমাংসখেকো বনমানুষদেরকে। সাবধান! বেশি কাছে আসবেন না কেউ! এরা বনমানুষ! এরা মানুষ খায়। মানুষের মাংস খায়। কিন্তু চেয়ে দেখুন—কত যেন শান্তশিষ্ট সুবোধ বালক! আসলে কিন্তু তা নয়। এদেরকে সুযোগ দেবেন না—সুযোগ পেলেই এরা খেয়ে ফেলবে আপনাকে। ভাই সকল! ভাই সকল…!'

রাউ আরও একটু সামনে এগোল। এমন কুৎসিত জীব সে এর আগে আর দেখেনি। লম্বা রাউয়ের বুক অবধি হবে বনমানুষ তিনটে। ভীষণ মোটা। ঘন কালো গায়ের রঙ। কালো লম্বা লোমে সারা গা ভর্তি।

তিনজনই টেবিলের উপর সারাক্ষণ লাফালাফি করছে, মুখ বাঁকিয়ে

ভ্যাঙচাচ্ছে। দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে আসছে তাদের মুখ থেকে।

শব্দ করে হেসে উঠল রাউ। এই হাসিটা হলো তার মৃত্যুর দিকে পঞ্চম পদক্ষেপ।

হাসির শব্দ শুনে কিন্তু কিম্ভূতকিমাকার বনমানুষ তিনটে তাকাল রাউয়ের দিকে। রাউয়ের হাসির অর্থ তারা ধরতে পারেনি। অবোধ জীব তারা। কিন্তু হাসির শব্দ শুনে তারা খুশি হয়ে উঠল। লাফাতে শুরু করল টেবিলের উপর আগের চেয়ে বেশি করে।

আবার হেসে উঠল রাউ। বনমানুষগুলো তার সঙ্গে যোগ দিল হাসিতে। চিৎকার করতে শুরু করল তারা বিকট স্বরে।

ব্যাপারটা চোখে পড়ল এবার ঘোষকের। রাউয়ের দিকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। রাউয়ের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ময়লা পোশাক, কদাকার মুখের চেহারা এবং বনমানুষগুলোর সঙ্গে তার ব্যবহার দেখে ঘোষকের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলল তার মাথায়। রাউকে সে জব্দ করতে চাইল।

'ভাই সকল! ভাই সকল! কান পেতে শুনুন। কান পেতে শুনুন আফ্রিকার জঙ্গলের বনমানুষরা কি বলছে। দুঃখের বিষয় আপনারা এদের ভাষা বোঝেন না। কিন্তু নো চিন্তা, আমি অনুবাদ করে বাংলায় বলে দিচ্ছি ওদের বক্তব্য।'

ঘোষক চোঙে মুখ ঠেকিয়ে চিৎকার করে বলে চলেছে। রাউকে দেখিয়ে সে বলছে, 'এই যে লোকটাকে দেখছেন—ভাল করে দেখুন লোকটার চেহারা! বনমানুষরা দাবি করছে এই লোকটা এককালে আফ্রিকায় বাস করত। এই লোক স্বয়ং বনমানুষ ছিল! শুধু তাই নয়, বনমানুষরা দাবি করছে, এই লোকই ছিল তাদের বড় ভাই—একই মায়ের পেটে ওদের চারজনের জন্ম···।'

উপস্থিত দর্শকরা গলা ছেড়ে হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। বনমানুষগুলো থমকে গেল। সবাইকে শব্দ করে হাসতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েছে তারা। কিন্তু পরমুহূর্তে তারা আবার লাফাতে শুরু করল। হঠাৎ তিনজনই হাত বাড়িয়ে দিল রাউয়ের দিকে।

ঘোষক বলে উঠল, 'দেখুন, ভাই সকল, দেখুন। বনমানুষরা তাদের হারিয়ে যাওয়া বড় ভাইকে কেমন সাদরে কাছে টানবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে···।'

রাগে, অপমানে দিশেহারা হয়ে পড়ল রাউ। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না। রাগে গালিগালাজ করতে করতে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল সে।

হন হন করে হাঁটছিল রাউ। রাগে জ্বলছে গা, কেউ যেন তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বেশ খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়াল সে। এদিকেও বেশ ভিড়। একটা তাঁবুর সামনে উঁচু চেয়ারে দাঁড়িয়ে আছে হাতির মত প্রকাণ্ড একজন লোক। নেংটি পরা লোকটার গায়ে কোন কাপড় নেই। চোখ পড়লে চোখ ফেরানো মুশকিল। সত্যিই লোকটা দৈত্যের মত দেখতে।

ঘোষক বলে চলেছে, 'মাত্র চার আনা। মাত্র চার আনা দিয়ে আপনারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীর লৌহমানবের দৈহিক কসরৎ দেখতে পারেন! জী-না হুজুর, এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না আমি। আমাদের ব্যায়ামবীর লৌহমানব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ

শক্তিশালী মানুষ। পৃথিবীর সব ব্যায়ামবীরের সঙ্গে লড়েছেন ইনি। কেউ আমাদের লৌহমানবকে পরাজিত করতে পারেনি। তবে, একমাত্র স্বনামধন্য বীরপুরুষ কুয়াশার সঙ্গে আমাদের লৌহমানব শক্তি পরীক্ষা করার সুযোগ পাননি।'

কুয়াশা! 'কুয়াশা কে? রাউ চিন্তা করতে শুরু করল। নামটা সে বহুবার শুনেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার। কুয়াশা! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, আদর্শবান এক মানুষ, গরীবের বন্ধু, অপরাধীদের যম।

ঘোষক বলে চলেছে, 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর কুয়াশাকে দেখবার সুযোগ আপনারা নাও পেতে পারেন। তার বদলে আমাদের লৌহমানবের দৈহিক কসরৎ দেখে নয়ন সার্থক করুন। মাত্র চার আনা।'

তাঁবুটার সামনে থেকে সরে গেল রাউ। বনমানুষগুলোর কথা সে ভুলতে পারছে না। রাগ তার দূর হয়নি এখনও। তার ধারণা সত্যি সত্যি বনমানুষগুলো তাকে তাদের বড় ভাই বলে দাবি করেছিল···।

হাঁটতে হাঁটতে থমকে দাঁড়াল রাউ। তার সামনে দিয়ে একটা যুবতী মেয়ে হেঁটে যাচ্ছে। নীল, টাইট প্যান্ট যুবতীর পরনে। গায়ে আঁটো লাল গেঞ্জি। পায়ে হাঁটু অবধি রাবারের জুতো। মাথায় চকচকে স্টিলের তারের নেট। মেয়েটি খুবই সুন্দরী, তার কোমরে ঝুলছে একটা চকচকে রিভলবার।

সুন্দরী মেয়েদের প্রতি রাউয়ের দুর্বলতা আছে। মেয়েটির পিছু নিল সে। লম্বা, পুরুষালি পদক্ষেপে মেয়েটি গিয়ে দাঁড়াল একটি তাঁবুর সামনে।

এই তাঁবুটার সামনে দুটো বিরাট বিরাট লোহার খাঁচা দাঁড় করানো রয়েছে। খাঁচার ভিতর দুটো করে চারটে সিংহ। মেয়েটি সোজা গিয়ে ঢুকল একটি খাঁচার ভিতর। সিংহ দুটো তাকে দেখেই গর্জে উঠল, আক্রমণাত্মক নানারকম ভঙ্গি করতে শুরু করল।

ঘোষক ঘোষণা করে চলে, 'মিস লাকীর দুঃসাহসিক খেলা দেখুন। বনের হিংস্র সিংহকে মিস লাকী কেমন চাবুক মেরে বশ করে রাখে তা দেখতে হলে টিকিট কিনে ঢুকে পড়ুন তাঁবুর ভিতর—একটি টিকেটের দাম মাত্র আট আনা।'

খানিকপর মেয়েটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল। তাঁবুর ভিতর ঢুকল সে। আট আনা দিয়ে টিকেট কিনে রাউও ঢুকল তাঁবুর ভিতর।

আধঘন্টা ধরে সিংহের খেলা দেখাল মিস লাকী। খেলা দেখিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেল সে। ভিড় ঠেলে রাউও বেরিয়ে এল। কিন্তু বাইরে এসে সে মিস লাকীকে কোথাও দেখতে পেল না।

আবার বনমানুষগুলোর কথা মনে পড়ে গেল রাউয়ের। মেজাজটা আবার খারাপ হয়ে গেল তার। সার্কাস পার্টির ছাউনি থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি ফিরল সে।

আবদুল্লা এমাম রাউ জানল না নিজের মৃত্যুর জন্য যতগুলো ভুল করা দরকার তার প্রায় সবগুলোই করে বসেছে সে।

কয়েক দিন কেটে গেল। মিরাকল সার্কাস পার্টি দর্শকের অভাবে লাল বাতি জ্বেলেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু সে খবর রাখে না রাউ। সে তার দো-চালায় বসে

ক'দিন থেকে শুধু গান গায়। নিজের হাতেই রান্না-বান্না করে সে। টাকার এখন অভাব নেই তার। খায় দায়, গান গায়—আর ঘুমায়।

সে রাতেও গলা ছেড়ে গাইছিল আবদুল্লা এমাম রাউ। দরজাটা বন্ধই ছিল। হঠাৎ একটা শব্দ হলো। গান থামিয়ে কান পাতল রাউ। আবার শব্দ। এবার পরিষ্কার শুনতে পেল সে শব্দটা। দুর্বোধ্য স্বরে কারা যেন কথা বলছে ঘরের বাইরে।

ঘরের দেয়ালের অর্ধেকটা কাঠের, অর্ধেকটা বেড়ার। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রাউ। বাইরের দিকে তাকাতেই সে দেখতে পেল ওদের। তিনটে বনমানুষ দাঁড়িয়ে আছে জানালার অদূরে।

বনমানুষগুলোকে দেখেই মাথায় রক্ত চেপে গেল রাউয়ের। পুরানো রাগটা তার শরীরে আগুন ধরিয়ে দিল। রক্ত চক্ষু মেলে ওদের দিকে চেয়ে রইল সে। বনমানুষ তিনটেকে অসহায় দেখাচ্ছে। সামনের দুটো হাত নেড়ে, মাথা ঘনঘন কাত করে, করুণ স্বরে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিল ওরা। মাঝে মাঝে নিজেদের পেটে হাত দিয়ে থাবা মেরে ইঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করছিল···আমাদেরকে খেতে দাও! আমরা ক্ষুধার্ত!

জানালার কাছ থেকে সরে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা বল্লমটা নিল রাউ। ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। বাইরে বেরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'শালারা! আমাকে সুযোগ পেয়ে অপমান করেছিলি—এবার মজা দেখাচ্ছি।'

কথাগুলো বলে রাউ প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল একটা বনমানুষকে। ছিটকে দুই হাত দূরে গিয়ে পড়ল সেটা। অপর দুটো লুটিয়ে পড়ল রাউয়ের পায়ের উপর। কিন্তু রাউয়ের মনে এতটুকু দয়ামায়ার উদ্রেক হলো না। বল্লমের আগা দিয়ে, পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল সে বনমানুষগুলোকে। খেপে গেছে রাউ। অন্ধের মত আঘাত করে চলেছে সে।

একসময় বনমানুষরা বুঝতে পারল, এই মানুষের কাছ থেকে দয়ামায়া আশা করা বৃথা। এ লোক খেতে তো দেবেই না—বরং মেরে খুনই করে ফেলবে। আহত, রক্তাক্ত বনমানুষরা খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে গেল। তাদের করুণ কান্নার শব্দ শোনা গেল অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর, হঠাৎ, তাদের চিৎকার একেবারে থেমে গেল।

'শালারা দুইজন মিলে একজনকে খেয়ে ফেলেছে সম্ভবত!'

দাঁতে দাঁত চেপে মন্তব্য করল রাউ। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

রাউ জানল না এইমাত্র সে তার মৃত্যুর সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করল।

দুই

কয়েক মাস কেটে গেল। টেকনাফ থেকে কাজের সন্ধানে কক্সবাজারে গেল রাউ। বছরের পাঁচ মাস সে কক্সবাজারেই থাকে। টুরিস্টদের সাহায্য করে এই পাঁচ মাস ভাল টাকা কামায় সে।

কিন্তু এবার ঘটনা অন্য রকম ঘটল। কক্সবাজারে মাস দু'য়েক রইল রাউ। একজন বিদেশী শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোককে কক্সবাজার এবং সংলগ্ন এলাকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখবার দায়িত্ব নিয়েছিল সে। এই টুরিস্ট ভদ্রলোকের একটা দামী ঘড়ি এবং একটা পিস্তল চুরি করল সে। চুরি করার পর কক্সবাজারে থাকা সম্ভব নয়, তাই অসময়ে ফিরে এল সে টেকনাফে।

রাউ নির্দিষ্ট সময়ের আগে ফিরে আসায় ইউনুস আদাং একটুও অবাক হয়নি। কারণ, রাউ খাপছাড়া ধরনের লোক। যখন যা ইচ্ছা তাই করে। নিজের ব্যবসা মন্দা যাচ্ছিল বলে সে এ ব্যাপারে মোটেই মাথা ঘামাল না। হঠাৎ একদিন রাউকে নিজের বাড়িতে ঢুকতে দেখে সে অবাক হলো।

রাউ এর আগে কখনও তার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। ইউনুসের অবাক হবার কারণ এটাই। সহাস্যে, সাদরে ঘরের ভিতর ডেকে বসাল ইউনুস রাউকে।

রাউয়ের চেহারা দেখে ইউনুস বুঝতে পারল লোকটা কোন খারাপ খবর নিয়ে এসেছে। রাউয়ের চোখেমুখে ফুটে রয়েছে ভয় ভয় ভাব। ঘামে ভিজে রয়েছে তার মুখ।

'ইউনুস, তুমি কোন শব্দ পাওনি? মিনিট কয়েক আগে আশ্চর্য ধরনের কোন শব্দ কানে ঢোকেনি তোমার?'

'শব্দ? আশ্চর্য ধরনের শব্দ? কই, না তো!'

রাউ হঠাৎ জানতে চাইল, 'আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি, ইউনুস। আচ্ছা, পাগলের লক্ষণ কি জানো তুমি?

ইউনুস অবাক হয়ে চেয়ে রইল রাউয়ের দিকে।

রাউ আবার বলল, 'পাগল হয়ে গেলে মানুষ আজেবাজে জিনিস দেখতে পায় না?'

ইউনুস বলল, 'ব্যাপার কি? কি হয়েছে তোমার?'

উত্তর দিল না রাউ। পকেট থেকে দশটাকার নোটের কয়েকটা বাণ্ডিল বের করল সে। সেগুলো বাড়িয়ে দিল ইউনুসের দিকে।

এই টাকাগুলো রাউ ইউনুসেরই গো-সাপের চামড়া বিক্রি করে পেয়েছিল।

'ইউনুস, আমার পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র তুমিই সত্যিকার সৎ, ভাল লোক। একটা উপকার করতে হবে আমার।'

'উপকার করতে বলছ—একশোবার করব! কিন্তু তার বদলে টাকা দিচ্ছ কেন···!'

রাউ ইউনুসকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'টাকাগুলো তোমার কাছে থাক। ইউনুস, হঠাৎ হয়তো দেখবে—আ-আমি নে-নেই! মানে আমি মরে যেতে পারি। আমার কথা বুঝতে পারছ তো, ইউনুস! আমি মরে যেতে পারি। শোনো, যদি আমার কিছু হয়, এই টাকা দিয়ে তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ডিটেকটিভকে নিয়োগ করবে। সে যেন আমার মৃত্যুর কারণ খুঁজে বের করে।'

ইউনুস টাকাগুলো নিল। কিন্তু বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি সে, 'রাউ, তোমার হয়েছে কি বলো তো! তোমার পেছনে কি শত্রু লেগেছে?'

রাউ বলল, 'সে-সব কথা শুনতে চেয়ো না। যা বললাম—কোরো। সবচেয়ে

বড় ডিটেকটিভকে নিয়োগ করবে তুমি। কথাটা মনে রেখো। ছোটখাট কাউকে নয়—তারা পারবে না রহস্যটা ভেদ করতে। তুমি বরং সম্ভব হলে কুয়াশার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করো। কথা দাও, ইউনুস···।'

'দিলাম কথা। কিন্তু···।'

ইউনুসের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিল না রাউ। চলে গেল সে। ইউনুস লক্ষ করল, রাউ ভয়ে একেবারে চুপসে আছে।

ঘরে ফেরার পথে ঘনঘন পিছন ফিরে এমনভাবে তাকাচ্ছিল রাউ যে, মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি তাকে ধাওয়া করছে।

ঘরে ঢুকে দ্রুত দরজা বন্ধ করে দিল সে। জানালা বন্ধই ছিল। আলনা, টেবিল, চেয়ার—যা কিছু আসবাব ছিল সব টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এল সে দরজার কাছে। জিনিসগুলো দরজার গায়ে ঠেকিয়ে এমনভাবে রাখল যাতে বাইরে থেকে কেউ দরজা খোলার চেষ্টা করলে সহজে যেন তা না পারে।

এরপর রাউ কাঠের দেয়াল থেকে নামাল টুরিস্টদের কাছ থেকে চুরি করা পিস্তলটা। সেটা রাখল বিছানার উপর। তারপর শুয়ে পড়ল।

শুলো বটে রাউ কিন্তু ঘুম এল না তার। রাত ক্রমশ বাড়তে লাগল। কান খাড়া করে আছে সে। যেন কিছু একটা ঘটবে।

রাত আরও গভীর হলো। ঘুম নেই রাউয়ের চোখে। কান খাড়া করে আছে সে। দূরের বনভূমি থেকে ভেসে আসছে বাঘের হুঙ্কার। ধস্তাধস্তির শব্দ। শোনা যাচ্ছে অদূরবর্তী সাগরের গর্জন।

একসময় ভোর হলো। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল রাউ। ঘুম ভাঙল তার বেশ বেলা করে। নাস্তা তৈরি করল সে। দুপুরের খাবার জন্য চুলোয় ভাত চড়াল। সারাটা দিন ঘরের বাইরে বের হলো না সে। দরজা-জানালা খুলল না ভুলেও।

দিনটা কেটে গেল। রাত এল আবার। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল রাউ। বিড়বিড় করে একবার বলল, 'ইউনুসকে ঘটনাগুলোর কথা বললে হত। পরশু রাতে যা দেখেছি···কিন্তু সেকথা বলা না বলা সমান। আমার কথা বিশ্বাস করবে না কেউ—আমাকে পাগল মনে করবে···।'

রাত গভীর হলো। ঘুমিয়ে পড়েছে রাউ।

বাইরে অদ্ভুত সব শব্দ হচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে মাঝে মাঝে বাঘের গর্জন। অচেনা পাখি ডাকছে। তার সঙ্গে ঝিঁঝি পোকার শব্দ আর সাগরের একটানা গর্জন তো আছেই। কিন্তু এসব সাধারণ শব্দ ছাড়াও আরও একটা শব্দ···!

ঘুম ভেঙে গেল রাউয়ের। ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানার উপর। কান পাতল। মনে হচ্ছে বাতাস ধাক্কা মারছে তার ঘরের দেয়ালে। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে ধরল রাউ পিস্তলটা। হাতের মুঠোয় নিল সেটাকে নিঃশব্দে। শব্দটাকে বাতাসের মনে হলেও রাউ জানে, ওটা বাতাসের শব্দ নয়।

থরথর করে কেঁপে উঠল রাউয়ের দেহটা। ঢোক গিলল সে অন্ধকারে। পিস্তলটা ধরে আছে সে দুই হাত দিয়ে শক্ত করে। হাতের তালু দুটো ভিজে গেছে ঘামে।

এতটুকু শব্দ না করে বিছানা থেকে মেঝেতে নামল রাউ। পা টিপে কাঠের দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। কাঠের গায়ে সরু ফাঁক। সেই ফাঁকে চোখ রেখে বাইরে তাকাল।

বাইরে জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। কি দেখল রাউ, তা সেই জানে। হাঁ করে, চোখ কপালে তুলে বিকট রবে আর্তচিৎকার করে উঠল সে। আতঙ্কে কাঁপতে লাগল তার শরীর। লাফ দিয়ে পিছনে এল সে কয়েক পা। তারপর দেয়ালের দিকে পিস্তল তুলে গুলি করল। কাঠের গায়ে একটার পর একটা ফুটো সৃষ্টি হতে লাগল। গুলি শেষ না হওয়া পর্যন্ত থামল না রাউ।

নতুন করে গুলি ভরল সে পিস্তলে। আবার শুরু করল গুলি। এবার একটা করে গুলি করার পর খানিকক্ষণ বিরতি নিল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমাকে খেয়ে ফেলতে এসেছে ওরা!'

গুলির শব্দ ছাপিয়ে আর একটি শব্দ শোনা গেল। শব্দটা আসছে উপরের দিক থেকে। বিস্ফারিত চোখে উপর দিকে তাকাল রাউ। ঠকঠক করে কাঁপছে সে। টিনের ছাদ দুলছে। মোটা মজবুত কাঠের ফ্রেম মড়মড় করে ভেঙে যাচ্ছে। কে বা কারা যেন খুলে নিচ্ছে ছাদের টিন।

ছাদের একটা অংশ তুলে ফেলা হলো। আকাশ দেখা যাচ্ছে তারা দেখা যাচ্ছে।

উন্মাদের মত গুলি করতে করতে পিছিয়ে গেল রাউ। পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল সে। সেই একই অবস্থা। ছাদ ভেঙে ফেলছে কারা যেন। এবার কাঠের ফ্রেম এবং টিন নেমে এল হুড়মুড় করে নিচের দিকে। পালাতে গিয়েও পারল না রাউ। চাপা পড়ে গেল সে।

রাত গভীর হলে কি হবে, রাউয়ের গুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে যেতে নিকটবর্তী প্রতিবেশি ইউনুস আদাং রওনা হয়ে গেল এমাম রাউয়ের বাড়ির দিকে।

রাউয়ের দো-চালার কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই ইউনুস লক্ষ করল, সব রকম শব্দ থেমে গেছে। খানিক আগে সে রাউয়ের একটানা আর্তনাদের শব্দ শুনেছে। এখন কোন শব্দই নেই।

দো-চালার কাছে পৌঁছে ইউনুস অবাক হয়ে গেল। দো-চালাটা নেই, আছে কেবল কাঠ আর টিনের স্তূপ। কাঠগুলো ভেঙেচুরে ছোট ছোট টুকরো হয়ে গেছে। টিনগুলো দোমড়ানো মোচড়ানো। যেন একদল দানব, দানবীয় শক্তিতে টিনগুলোকে ধরে কাগজের মত দুমড়ে ফেলেছে, মুচড়ে ফেলে দিয়েছে। মোটা মোটা এক একটা বাঁশ শত টুকরো হয়ে পড়ে রয়েছে। টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে লাগল ইউনুস। তার সন্দেহ হলো—এসব কি সত্যিই দেখছে সে, না স্বপ্ন দেখছে?

একসময় একটু চমকে উঠল ইউনুস। অদূরবর্তী সাগরের পানিতে কে বা কারা যেন দাপাদাপি করছে বলে সন্দেহ হলো তার। শব্দটা সে পরিষ্কার শুনল। মাছ বা হাঙর হবে মনে করে সেদিকে পা বাড়াল না সে। পানিতে দাপাদাপির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। দাপাদাপির শব্দটাও ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে—একসময় তা-ও আর শোনা গেল না।

রাউ কোথায়? কাঠ, টিন আর বাঁশের স্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছে নাকি?

কোন রকম সাহায্য পাওয়া যাবে না এত রাতে, জানত ইউনুস। কাছে পিঠে আর কোন বাড়ি-ঘর নেই। অগত্যা একাই সে স্তূপ সরাবার কাজে হাত লাগাল। ঘন্টা খানেক পরিশ্রম করার পর কাদার মত খানিকটা নরম জিনিস হাতে ঠেকল ইউনুসের। তারপর সে বুঝতে পারল কাদা নয়, জিনিসটা মাংসপিণ্ড। আরও ভাল করে দেখার পর আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ইউনুস। মাংসপিণ্ডটা যে রাউয়ের দেহ ছাড়া আর কিছু নয় তা বুঝতে পারল সে। বুঝতে পেরে ভয়ে কেঁপে উঠল সে, দৌড়ুতে লাগল নিজের বাড়ির দিকে।

দৌড়ে পালাবার সময় ইউনুস আদাং বুঝতে পারল—রহস্যটা একমাত্র কুয়াশা ছাড়া আর কারও পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়।

তিন

তিনদিন পর এক সকালে বি,আর,টি,সি-র একটা কোচে উঠল ইউনুস আদাং। কক্সবাজার হয়ে কোচ যাবে চট্টগ্রাম শহরে।

কক্সবাজারে কোচ পৌঁছুল বেলা এগারোটায়। আধঘণ্টা বিরতি। নিচে নেমে সেদিনের দৈনিক পত্রিকা কিনল ইউনুস। হকারের কাছে গত কয়েক দিনের পুরানো কিছু পত্রিকা দেখল সে। সেগুলোও কিনে নিল। একটা রেস্তোরাঁয় বসে হালকা খাবার খেলো। তারপর আবার উঠল কোচে।

ইউনুস নিজের সীটে বসে খবরের কাগজে মনোনিবেশ করল। কয়েক দিনের পুরানো কাগজগুলোয় কুয়াশা সম্পর্কে ছোটখাট কিছু খবর ছিল। এই খবরগুলো পড়ার জন্য পত্রিকা কিনেছে সে। একটা একটা করে পড়তে শুরু করল সে খবরগুলো।

একটা খবরে বলা হয়েছে, কুয়াশা আড়াই হাজার পিতা-মাতাহীন এতিম কিশোর-কিশোরীকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগ্রহ করে নিজের প্রতিষ্ঠিত মডেল স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে। তারা সেখানেই থাকবে এবং পড়াশোনা করবে। তাদের খাওয়া, থাকা এবং বিদ্যা অর্জনের জন্য যা খরচ হবে তার সবটাই দেবে কুয়াশা। আর একটা খবরে জানানো হয়েছে, মারাত্মক একটা মারণাস্ত্র আবিষ্কার করেছে কুয়াশা, সেই আবিষ্কারের ফর্মুলা সে দান করেছে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীকে।

মগ্ন হয়ে খবরগুলো পড়ছিল ইউনুস আদাং। পাশের সীটে বসা লোকটা তাকে অনেকক্ষণ থেকে আড়চোখে দেখছে তা সে বুঝতেই পারেনি।

পাশের সীটের লোকটা তার পিছু পিছু কোচে চড়েছে সেই টেকনাফ থেকেই। লোকটার বয়স হবে পঁয়ত্রিশ। স্বাস্থ্যটা খুবই ভাল। চেহারাটা একটু রুক্ষ ধরনের। মাথায় ছোট ছোট চুল। ট্রাউজার এবং শার্ট পরে আছে। দামী সিগারেট খাচ্ছে লোকটা। কোলের উপর পড়ে রয়েছে একটা স্প্যানিশ গিটার। লোকটার

মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কপালে লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন।

ইউনুস আদাং পুরানো খবরের কাগজগুলো পড়া শেষ করল। সেদিনের পত্রিকাটা খুলল সে এবার।

পত্রিকাটা খুলতেই বড় বড় কয়েকটা অক্ষর লাফ দিয়ে চোখের সামনে চলে এল যেন। পুরানোগুলোর মতই, এ পত্রিকাটিতেও বিদঘুটে একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে।

বড় সড় চারকোনা একটা জায়গায় কয়েকটা মাত্র শব্দ—বাকি অংশটা সাদা, ফাঁকা। শব্দ কয়েকটা এইরকম:

সাবধান!

দানবের দল এল বলে!

পাশের সীটের লোকটা হঠাৎ ইউনুসের উদ্দেশে কথা বলে উঠল, 'কি ভাই, কোথায় যাবেন?'

ইউনুস তাকাল। মৃদু হাসল সে। বলল, 'যাব চট্টগ্রাম। আপনি?'

'আমিও! তা পুরানো খবরের কাগজ পড়ছিলেন কেন বলুন তো? দেখলাম বেছে বেছে কুয়াশা সংক্রান্ত খবরগুলো পড়লেন···।'

ইউনুস নড়েচড়ে বসল। বলল, 'কুয়াশা সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি। তাঁর সম্পর্কে সব কথা জানতে ইচ্ছা করে। তাই পড়ছিলাম। প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, শক্তিতেও অদ্বিতীয়—সত্যি এযুগে এমন গুণী লোক বোধহয় দ্বিতীয়টি নেই। বাংলাদেশ কুয়াশার জন্যে গর্বিত।'

'তা ঠিক। কুয়াশা সত্যি বাংলাদেশের গর্ব।'

ইউনুস জানতে চাইল, 'আচ্ছা, কুয়াশা কি ডিটেকটিভ?'

'না। ডিটেকটিভ নয় সে।'

নিরাশ হলো ইউনুস। একটু যেন চিন্তিত দেখাল তাকে।

পাশের লোকটা বলল, 'কি ব্যাপার, কুয়াশা ডিটেকটিভ নয় শুনে আপনি যেন মুষড়ে পড়লেন।'

'না···হ্যাঁ, মানে···আসলে বুঝলেন, আমি যাচ্ছি একটা কেস নিয়ে কুয়াশার সঙ্গে দেখা করতে···।'

ইউনুস আদাং গড় গড় করে বলে ফেলল আদ্যোপান্ত সব ঘটনা। রাউ-এর বিদঘুটে আচরণ, তার রহস্যময় মৃত্যু—সব কথাই বলল সে।

ইউনুস সাদাসিধে মানুষ, সে লক্ষই করল না তার কথা শুনতে শুনতে লোকটার চেহারার পরিবর্তন ঘটে গেছে, গম্ভীর হয়ে উঠেছে সে। সব কথা শুনে লোকটা বলল, 'হুঁ।'

আর কিছু না বলে লোকটা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

ইউনুস আবার খবরের কাগজে মন দিল। হঠাৎ একটা খবর দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। আবদুল্লা এমাম রাউয়ের মৃত্যু সম্পর্কে পুলিসের ধারণা কি তা লেখা হয়েছে বিস্তারিত। খবরটা পড়ল ইউনুস। বাঁকা হয়ে গেল তার মুখ। পুলিস কর্তৃপক্ষের ধারণা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হলো না তার। সাংবাদিকরাও তাদের ধারণার কথা

ছেপেছে। দুই দলেরই বক্তব্য একরকম। ওদের ধারণা অদ্ভুত ধরনের একটা টর্নাডোর আক্রমণে নিহত হয়েছে রাউ।

গোটা ব্যাপারটাই অবাস্তব এবং হাস্যকর। টর্নাডো না ছাই। টর্নাডো হলে সে ঠিকই জানতে পারত। তাছাড়া আকাশ ছিল সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত। টর্নাডোর প্রশ্নই ওঠে না···। পকেট থেকে কলম বের করে খবরটার হেডিংগুলোর নিচে দাগ দিয়ে রাখল সে।

বেলা পাঁচটার সময় চট্টগ্রাম শহরে থামল কোচ। খবরের কাগজগুলো বগলদাবা করে উঠে দাঁড়াল ইউনুস। এমন সময় তার সামনে একটা যুবতী মেয়েকে দেখল সে। মেয়েটির পরনে শাড়ি নয়, প্যান্ট। গায়ে লাল শার্ট। মাথার চুলে স্টিলের তারের নেট। মেয়েটির স্বাস্থ্যটা খুবই ভাল। কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলছে। ব্যাগটার গায়ে লেখা রয়েছে: মিরাকল সার্কাস পার্টি।

মিরাকল সার্কাস পার্টি—মনে পড়ে গেল ইউনুসের। টেকনাফে খেলা দেখাচ্ছিল এই পার্টি। বেশ কয়েক মাস আগের কথা অবশ্য। খেলা দেখাতে দেখাতেই টাকার অভাবে, প্রতিষ্ঠানটা ভেঙে গেছে। সার্কাস দলটা ভেঙে যাবার পর একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল টেকনাফ শহরে। গুজবটার কথা বিশেষ করে মনে আছে তার। গুজবটা হলো বনমানুষ সম্পর্কিত। সার্কাস পার্টির তিনটে বনমানুষ ছিল। পার্টি ভেঙে যাবার ক'দিন পর বনমানুষ তিনটে নাকি রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়।

ভিড়ের সঙ্গে নিচে নামল ইউনুস আদাং। চট্টগ্রাম শহরে এর আগে আসেনি সে। অপরিচিত শহর। ভয় ভয় লাগে। ইউনুস এদিক-ওদিক তাকাল। তার পাশের সীটে বসা লোকটা গেল কোথায়? লোকটার সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়ে গেছে। তাকে জিজ্ঞেস করে কয়েকটা কথা জেনে নিলে হত। কুয়াশার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে—কিন্তু কুয়াশার ঠিকানাই তো সে জানে না।

কিন্তু লোকটাকে সে দেখতেই পেল না।

ইউনুস দেখতে না পেলেও লোকটা কিন্তু ঠিকই দেখতে পাচ্ছিল ইউনুসকে। কোচ থেকে নেমে আড়াল থেকে দেখছে লোকটা তাকে।

খানিকক্ষণ ইতস্তত করার পর ইউনুস পা বাড়াল একটা ট্যাক্সির দিকে। ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বলল, 'দেখো ভাই, এই শহরে আমি নতুন। আমি যাব কুয়াশার কাছে। কিন্তু তার ঠিকানা···।'

ড্রাইভার সহাস্যে বলল, 'কুয়াশার ঠিকানা? দরকার নেই। গাড়িতে উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন। কুয়াশার ঠিকানা এই শহরের সবাই জানে।'

ট্যাক্সিতে চড়ল ইউনুস। ড্রাইভার স্টার্ট দিল। এমন সময় একটা হকার চিৎকার করে উঠল, 'নতুন খবর! দানবের দল আসছে। ঢাকার পত্রিকায় নতুন খবর।'

'এই ড্রাইভার, দাঁড়াও ভাই। একটা পত্রিকা কিনে নিই আগে।'

ইউনুস হকারকে ডাকল গাড়ির ভিতর বসে বসেই।

চল্লিশ পয়সা দিয়ে একটা পত্রিকা কিনল ইউনুস।

ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, 'কি যে ব্যাপার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এমন আশ্চর্য বিজ্ঞাপনের কথা বাপের কালে শুনিনি। সবগুলো কাগজে ছাপা হচ্ছে!'

কাগজটা মেলে ধরতেই ইউনুস দেখতে পেল বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে:

হুঁশিয়ার!

দানব বা দৈত্য যাই বলুন
যে-কোন মুহূর্তে আপনার শহরে
হানা দিতে পারে!

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। ট্যাক্সিকে অনুসরণ করছে একটা সাদা রঙের ফোক্সওয়াগেন গাড়ি। গাড়ির পিছনের সীটে বসে আছে যে লোকটা সেই টেকনাফ থেকে চট্টগ্রামে আসার সময় কোচে ইউনুসের পাশের সীটে বসে ছিল।

ড্রাইভারের উদ্দেশে কথা বলে উঠল লোকটা, 'শরীফ, লোকটা যাচ্ছে কুয়াশার সঙ্গে দেখা করতে। কুয়াশাকে রাউয়ের হত্যা-রহস্যের কথা বলবে ও। এ হতে দেয়া যায় না। অথচ বসের সঙ্গে পরামর্শ না করে আমি কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারছি না···।'

ড্রাইভার শরীফ বলল, 'বসের সাথে ফোনে কথা বলুন, স্যার। গাড়ি থামাই। কোন দোকান থেকে ফোন করুন। ট্যাক্সিটা এগিয়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিকই ধরে ফেলব আমি।'

'তাহলে থামাও দেখি।'

থামল ফোক্সওয়াগেন। গাড়ি থেকে নেমে একটা ডাক্তারখানায় ঢুকে ফোন করার জন্য অনুমতি নিয়ে ডায়াল করল লোকটা। অপরপ্রান্ত থেকে কর্কশ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যালো।'

'আমি জগদীশ বলছি, বস্। টেকনাফের ইউনুস—যা ভয় করেছিলাম তাই সে করতে যাচ্ছে···।'

'ঠিক জানো?'

'জানি, বস্। সব কথা বের করে নিয়েছি ব্যাটার পেট থেকে কোচে এখানে আসার সময়···।'

কর্কশ কণ্ঠস্বর থেকে নির্মম নির্দেশ ভেসে এল, 'সেক্ষেত্রে উপায় নেই। শেষ করে দাও। কুয়াশার কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই পাঠিয়ে দাও ব্যাটাকে যমের বাড়ি।'

ট্যাক্সি ছুটছে। ব্যাকসীটে চুপচাপ বসে আছে ইউনুস আদাং। রীতিমত উত্তেজিত এবং নার্ভাস হয়ে পড়েছে সে ভিতরে ভিতরে। কুয়াশার মত পৃথিবী বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে সে। ঘাবড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। অতবড় একটা প্রতিভা—তার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হবে, কি ভাবে তাঁকে সম্মান জানাতে হবে—এই সব ঠিক করতে হিমশিম্ খাচ্ছিল সে। তাছাড়া বারবার সন্দেহ হচ্ছিল তার—কুয়াশা কি সময় পাবেন তার মত মূল্যহীন একটা লোকের সঙ্গে দেখা করার?

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে থামল ট্যাক্সি। ড্রাইভার বলল, 'পৌঁছে গেছি!'

জানালা পথে বাইরে তাকাল ইউনুস আদাং। রাস্তার দু'পাশেই সারি সারি

সুউচ্চ অট্টালিকা। ট্যাক্সি থেমেছে পাঁচ তলা একটা প্রকাণ্ড বিল্ডিংয়ের সামনে।

'এই বিল্ডিংয়ের ওপরের তলায় কুয়াশার হেডকোয়ার্টার।'

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নামল ইউনুস। এগিয়ে গেল সে সামনে।

পাঁচ তলায় ওঠার জন্য দুটো এলিভেটর আছে। একটি এলিভেটর ব্যবহার করে সকলে, অপরটি কুয়াশা একা। কিন্তু এলিভেটরের দিকে এগোল না ইউনুস। সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

এক তলা, দুই তলা, তিন তলা···। পাঁচ তলায় উঠল ইউনুস অবশেষে। চওড়া করিডর ধরে এগোল সে। কয়েকটা রুমের দরজা দেখল সে। কিন্তু থামল যে দরজার গায়ে ড. মনসুর আলী লেখা রয়েছে সেটার সামনে।

দরজার গায়ে একটা বোতাম দেখা যাচ্ছে। ইউনুস আদাং সেই বোতামটা চেপে ধরল।

কয়েক সেকেণ্ড পর খুলে গেল দরজা। দরজার সামনে দেখা গেল দীর্ঘকায় ঋজু, বলিষ্ঠ চেহারার একজন সুপুরুষকে। ইউনুস মুগ্ধ, সম্মোহিত হয়ে পড়ল যেন চেহারাটা দেখে। এমন স্বাস্থ্য, এমন রূপ—জীবনে দেখেনি সে। এই মানুষই যে পৃথিবী বিখ্যাত কুয়াশা তা তাকে বলে দিতে হলো না।

তবু পরিচয়টা জেনে নিতে চাইল ইউনুস, 'আপনি স্বনামধন্য কুয়াশা?'

কুয়াশা বলল, 'আমি কুয়াশা।'

ইউনুস বলল, 'আমি টেকনাফ থেকে এসেছি আপনাকে একটা রহস্যময় ব্যাপারে···।'

করিডরের প্রান্তে ক্লিক করে শব্দ হলো একটা। এলিভেটরের দরজা খুলে যাবার শব্দ ওটা। এলিভেটর থেকে করিডরে নামল জগদীশ। তার হাতের গিটারটা লম্বালম্বিভাবে ধরেছে সে, সোজা ইউনুসের দিকে, অনেকটা রাইফেল ধরার ভঙ্গিতে।

জগদীশ গিটারের তারে আঙুল পেঁচিয়ে টান দিল। বিকট শব্দ হলো একটা।

জগদীশের গিটারটা আসলে মোটেই গিটার নয়। রাইফেলেরই রূপান্তরিত সংস্করণ ওটা।

পিঠে গুলি খেয়ে পড়ে গেল ইউনুস আদাং। হার্ট ভেদ করে গেছে বুলেট। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়েছে তার।

চার

ইউনুস আদাং করিডরের উপর পড়ে যেতেই খুনী জগদীশ কুয়াশাকে দেখতে পেল। কুয়াশা দরজার ওপারে, কামরার ভিতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালো আলখেল্লা ঢেকে রেখেছে তার সর্বাঙ্গ, শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। উন্নত ললাটে দু'একটা চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। এত বড় একটা ঘটনা চোখের সামনে ঘটে গেল—কিন্তু আশ্চর্য! কুয়াশার মধ্যে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে না।

খুনী জগদীশ লক্ষ করল কুয়াশা অনড় দাঁড়িয়ে থাকলেও তার দাঁড়িয়ে থাকার

ভঙ্গি এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবার ভঙ্গির মধ্যে ভয়ঙ্কর একটা বিপদ যেন ওত পেতে রয়েছে। কুয়াশা নিরস্ত্র। জগদীশের হাতে রয়েছে মারাত্মক মারণাস্ত্র। কুয়াশা তাকে দেখে ফেলেছে—সুতরাং তার অপরাধের একমাত্র সাক্ষী সে। কুয়াশাকে মেরে ফেলতে পারে সে অনায়াসে।

এতসব কথা এক কি দুই সেকেণ্ডের মধ্যে ভেবে নিল খুনী জগদীশ। গিটারটা আবার তুলল সে। গুলি করল।

পর পর চারটে গুলি ছুটে গেল কুয়াশার বুক বরাবর।

কিন্তু একি! একি জাদু! কুয়াশা এতটুকু নড়েনি, সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ একটা বুলেটও তাকে স্পর্শ করেনি। দরজার কাছে গিয়ে বুলেটগুলো ছিটকে ফিরে আসছে।

করিডরে পড়ে রয়েছে বুলেটগুলো।

আবার গুলি করল জগদীশ। হাত কাঁপছে তার। সেই একই দশা হলো বুলেটগুলোর। দরজার কাছে অদৃশ্য কিছুতে বাধা পেয়ে ফিরে আসছে প্রত্যেকটি বুলেট, ছিটকে পড়ছে করিডরে।

ভয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে এলিভেটরের ভিতর ঢুকল জগদীশ। বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। পালাচ্ছে সে।

জগদীশ অদৃশ্য হয়ে যেতেই কুয়াশা দীর্ঘ পদক্ষেপে কামরার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ইন্টারকমের সুইচ অন করে বলল সে, 'করিডরে কি ঘটে গেল দেখেছ, ওমেনা?'

রাজকুমারী নয়, উত্তর দিল ডি. কস্টা, 'বস্। হামরা ডুইজনই ডেকিয়াছি। রাজকুমারী ফলো করিয়াছেন মার্ডারারকে, হামিও যাইটেছি···।'

দীর্ঘ পদক্ষেপে দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। সুইচ বোর্ডের গায়ে অসংখ্য বোতাম দেখা যাচ্ছে। একটা ধূসর রঙের বোতাম চেপে ধরল সে। সরে গেল কাঁচ, কোন শব্দ হলো না। কুয়াশা জানে, দরজার সামনের বুলেট প্রুফ কাঁচের দেয়ালের জন্য জগদীশের বুলেট আঘাত করতে পারেনি ওকে। কাঁচটা এমনই স্বচ্ছ যে আধহাত দূর থেকেও এটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল কুয়াশা। ইউনুস আদাং-এর মৃতদেহটা দুই হাত দিয়ে তুলে নিল বুকের কাছে। কামরার ভিতর, কার্পেটের উপর ধীরে ধীরে লাশটা শুইয়ে দিল। তারপর বন্ধ করে দিল দরজা।

ইউনুস আদাংয়ের দেহটা পরীক্ষা করল কুয়াশা। গুলি খেয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়েছে লোকটার। তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দশ টাকার নোটের কয়েকটা তোড়া বের করল কুয়াশা। কটু একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। নাকের কাছে নোটের বাণ্ডিলগুলো ধরল সে।

গো-সাপের চামড়ার গন্ধ চিনতে পারল কুয়াশা।

ইউনুসের হাতে ছিল কয়েকটা খবরের কাগজ। কাগজগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল কুয়াশা। খবরের হেডিংগুলোর নিচে কলম দিয়ে দাগ দেয়া হয়েছে।

খবরটা এইভাবে ছাপা:

টেকনাফে রহস্যময় টর্নাডোয় এক ব্যক্তি নিহত

আবদুল্লা এমাম রাউ নামক এক স্বল্প-শিক্ষিত টুরিস্ট গাইড গত তিন দিন আগে রহস্যময় কারণে মৃত্যুবরণ করেছে বলে জানিয়েছেন আমাদের স্থানীয় সংবাদদাতা। পুলিস কর্তৃপক্ষ সূত্রে প্রকাশ, অপরিচিত ধরনের ভয়ঙ্কর একটা টর্নাডো এমাম রাউয়ের দো-চালা বাড়িটাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে। সেই বাড়ির নিচে চাপা পড়ে মারা যায় এমাম রাউ। এমাম রাউয়ের নিকটবর্তী প্রতিবেশী ইউনুস আদাং আশ্চর্য ধরনের কিছু শব্দ শুনে গভীর রাতে অকুস্থলের দিকে ছুটে যায়। সেখানে গিয়ে সে দেখে দো-চালাটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। লাশটা সে আবিষ্কার করে ধ্বংস স্তূপের নিচে। ইউনুস আদাংয়ের ধারণা টর্নাডো নয়, রাউয়ের মৃত্যুর জন্য অন্য কোন কারণ দায়ী। কিন্তু পুলিস কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে একমত নয়।

পুলিস সূত্রে আরও প্রকাশ, টর্নাডো শুধু মাত্র দো-চালাতেই আক্রমণ চালায়। আশে পাশের গাছ পালার একটি পাতাও খসে পড়েনি। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে টর্নাডোই যে এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এমাম রাউ টুরিস্ট-গাইড হিসেবে কাজ করলেও মাছ ধরার কাজও সে করত। টেকনাফ বাজারের কয়েকজন ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, কিছুদিন আগে সে প্রচুর পরিমাণে গো-সাপের চামড়া বিক্রি করে।

খবরটা পড়া শেষ করে কুয়াশা অনুমান করল টাকার বাণ্ডিলে যেহেতু গো-সাপের চামড়ার গন্ধ রয়েছে সেইহেতু টাকাগুলো এমাম রাউয়ের হলেও হতে পারে।

টাকার বাণ্ডিলগুলো ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করল কুয়াশা। দেখা গেল ইউনুসের হাতের ছাপ রয়েছে নোটগুলোয়। কিন্তু তা খুব অল্প কয়েকটা নোটে। বেশিরভাগ নোটে পাওয়া গেল অন্য এক লোকের হাতের ছাপ। কুয়াশা অনুমান করল অন্য হাতের ছাপগুলো এমাম রাউয়ের হতে পারে।

ইউনুস আজই টেকনাফ থেকে চট্টগ্রাম শহরে এসেছে তা বোঝা গেল তার পকেটে পাওয়া কোচ সার্ভিসের টিকেট দেখে।

সেদিনের খবরের কাগজটা আবার একবার মেলে ধরল কুয়াশা। বড় বড় অক্ষরে লেখা বিজ্ঞাপনটা পড়ল।

এই বিজ্ঞাপন আগেও সে লক্ষ করেছে। দেশের প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিক পত্রিকায় গত কয়েকদিন থেকে এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটা ছাপা হচ্ছে। কে এই বিজ্ঞাপন প্রচার করছে, কেন করছে, কিছুই জানা যাচ্ছে না।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে।

পর পর কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা অফিসে ফোন করে বিশেষ কিছু জানতে পারল না কুয়াশা। জানা গেল, ডাকযোগে আসে বিজ্ঞাপনগুলো পত্রিকা অফিসে। ছাপা বাবদ খরচের টাকা অগ্রিম পাঠিয়ে দেয়া হয়। আরও জানা গেল, প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপন এসেছে টেকনাফ থেকে। বিজ্ঞাপন দাতা তার নাম বা নির্দিষ্ট ঠিকানা

জানাননি।

পাঁচ

ঘণ্টা দু'য়েক পর প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। ওয়্যারলেস সেটের ভিতর থেকে ভেসে এল ডি. কস্টার সরু কণ্ঠস্বর, 'বস্, হামি বহু ডুর হইটে কঠা বলিটেছি। মার্ডারারকে ফলো করিয়া হামরা রাঙ্গামাটি চলিয়া আসিয়াছি।'

কুয়াশা বলল, 'রাঙ্গামাটি? অতদূর? ঠিক কোথায়?'

'মিস ওমেনাকে রাখিয়া আসিয়াছি একটি পাহাড়ের উপর। হামি হাপনার জন্য উষা রোডে ওয়েট করিটেছি।'

'আসছি আমি।'

সেট অফ করে দিয়ে তৈরি হলো কুয়াশা। নিজের ব্যক্তিগত এলিভটরে চড়ে নিচে নামল সে। নিচে মানে, একেবারে আণ্ডার গ্রাউণ্ড গ্যারেজে। সেখান থেকে নীল রঙের একটা ঝকঝকে মার্সিডিস নিয়ে বেরিয়ে গেল কুয়াশা শহরের রাস্তায়।

মার্সিডিস তুমুল বেগে ছুটে চলল রাঙ্গামাটির দিকে।

রাঙ্গামাটি পৌঁছুতে দেড় ঘণ্টার মত লাগল কুয়াশার। উষা রোডে অপেক্ষা করছিল ডি. কস্টা। গাড়িতে তুলে নিল সে তাকে।

'সিটে যাইটে হইবে, তারপর ডাইন ডিকে, টারপর বাম ডিকে, তারপর আবার ডাইন ডিকে এবং এগেন বাম ডিকে···।'

কুয়াশা বলল, 'ক'মাইল?'

ডি. কস্টা বলল, 'ডুই মাইল। মাই গড, বস্, টপ ইমপরট্যান্ট কোশ্চেনটাই করিটে ভুলিয়া গিয়াছি। টিভিটে টো ডেকিলাম লোকটাকে মার্ডার করিল গিটারের মটো ডেকিটে রাইফেল ডিয়া। বাট হিস্টরিটা কি বলুন টো? দ্যাট আনলাকী ম্যান—সে মার্ডারড্ হইল কেন—হোয়াই? বস্, ডাইন ডিকে টার্ন নিন।'

কুয়াশা বলল, 'মুখ বন্ধ করার জন্য খুন করা হয়েছে। আমার সন্দেহ, খুনী লোকটা ভাড়াটে। সেইজন্যেই ওকে আমি ধরবার চেষ্টা করিনি। যার হয়ে কাজ করছে তার কাছে পৌঁছুতে চেয়েছিলাম আমি। আপনারা অনুসরণ করে লোকটাকে যেখানে ঢুকতে দেখেছেন সেখানে নিশ্চয়ই লোকটার ওপরওয়ালাকে পাওয়া যাবে।'

ডি. কস্টা জানতে চাইল, 'মার্ডারড ম্যান হাপনাকে কিছু বলিটে আসিয়াছিল। কি বলিটে আসিয়াছিল?'

'গত কয়েকদিন থেকে খবরের কাগজগুলোয় যে রহস্যময় বিজ্ঞাপনগুলো বের হচ্ছে—লক্ষ করেছেন?'

'মাই গড! হাপনি বলিটে চাহিটেছেন, "ডানব হইটে সাবধান!" "হুশিয়ার! ডৈট্য আসিটেছে," "টেরর! দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য মনস্টার ব্রিংস্"—এই সকল অ্যাডভার্টাইজমেন্টের কঠা?'

'হ্যাঁ। সারা দেশের পত্রপত্রিকায় ছাপা হচ্ছে বিজ্ঞাপনগুলো। টেকনাফের পোস্ট অফিসের ছাপ পাওয়া গেছে এনভেলাপগুলোয়। তারমানে টেকনাফ থেকে

ডাকযোগে এগুলো পত্রিকা অফিসে আসছে। যে লোকটা খুন হলো সে-ও টেকনাফের লোক।'

'টেকনাফের লোক! মাই গড! টাহলে এই বিজ্ঞাপনগুলোর সাঠে টার খুন হবার কানেকশান ঠাকিটে পারে—টাই না? বাট টেকনাফের এই লোক হাপনাকে কি বলিটে আসিয়াছিল? বাম ডিকে।'

'সম্ভবত এমাম রাউ নামের এক লোকের রহস্যময় মৃত্যু সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাতে এসেছিল লোকটা। এমাম রাউ মারা গেছে টেকনাফে। পুলিস আর স্থানীয় সংবাদদাতাদের মতে রহস্যময় ধরনের একটা টর্নাডোর কবলে পড়ে এমাম রাউয়ের বাড়ি। সেই বাড়ি ধসে পড়ে, ধ্বংস্তূপের নিচে চাপা পড়ে নিহত হয় এমাম রাউ। আমাদের হেডকোয়ার্টারের করিডরে যে লোক খুন হয়েছে তার নাম ইউনুস আদাং। রাউয়ের মৃত্যু সম্পর্কে তার ধারণা ছিল অন্যরকম। টর্নাডোর কবলে মারা গেছে রাউ—একথা সে বিশ্বাস করত না।'

'টর্নাডো নয়টো কি? টার মটামট কি ছিল?'

কুয়াশা বলল, 'তার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ সে পায়নি।'

পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। পাহাড়ের ঢালু গায়ে ঝোপ-ঝাড় আর গাছপালা। নির্জন চারদিক। নিশ্চুপ।

ডি. কস্টার নির্দেশে গাড়ি থামাল কুয়াশা।

'হাউ স্ট্রেঞ্জ! রাজকুমারীকে ডেকিটেছি না কেন! টাহাকে হামি এই জায়গায় রাখিয়া গিয়াছিলাম।'

কুয়াশা গাড়ি থেকে নামল। বলল, 'জায়গা চিনতে ভুল হয়নি আপনার?'

'নো—! মাই গড! হামার বাচ্চা স্পুটনিককেও ডেকছি না!'

স্পুটনিক ডি. কস্টার পোষা কুকুর। মাত্র তিন মাস বয়স স্পুটনিকের।

ডি. কস্টা বলল, 'রাজকুমারী নিশ্চয়ই বিপড়ে পড়িয়াছেন! টাহাকে মুক্ত করিটে ছুটিয়া গিয়াছে হামার স্পুটনিক!'

এমন সময় দেখা গেল রাজকুমারী একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে। দ্রুত হাঁটছে সে। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, হাঁপাচ্ছে। তার বুকের কাছে দেখা যাচ্ছে স্পুটনিককে।

কাছে এসে রাজকুমারী ছুঁড়ে ফেলে দিল স্পুটনিককে। ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠল, 'মি. ডি. কস্টা, এরপর যদি আপনি আপনার স্পুটনিককে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বের হন, তার ফল ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। বাব্বা! আপনি চলে যাবার পর সেই যে ছুটোছুটি শুরু করেছে, থামায় কার সাধ্যি!'

ডি. কস্টা আদর করে স্পুটনিককে কোলে তুলে নিল। বলল, 'ছোট্ট বাচ্চা, খেলাটুলা টো করিবেই। ও কি আর হামাডের মটো বড় হইয়াছে? বড় হইলে এটো ডুষ্টামি করিবে না।'

রাজকুমারী বলে উঠল, 'আপনার কুকুর, আপনিই সামলে রাখুন। দয়া করে আমার দায়িত্বে ওকে আর কখনও রেখে যাবেন না।'

কুয়াশা ওদের কথা শুনছিল না। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাহাড়গুলো দেখছিল

সে। রাজকুমারীর দিকে তাকাল এবার। জানতে চাইল, 'বাড়ি ঘর তো কোথাও দেখছি না?'

ডি. কস্টা বলে উঠল, 'এখান হইটে ডেকা যাইবে না। হামাডেরকে হাঁটিটে হইবে খানিকটা।'

হাঁটতে শুরু করল ওরা।

রাজকুমারী বলল, 'কুয়াশা, খুনী লোকটা আশ্চর্য একটা জায়গায় গিয়ে ঢুকেছে।'

ডি. কস্টা বলল, 'প্রকাণ্ড একটা পাহাড়ের উপর চল্লিশ ফুট টল একটা পাঁচিল···।'

রাজকুমারী বলল, 'খুবই অবাক কাণ্ড। পাহাড়ের উপর অত উঁচু পাঁচিল তৈরি করার কি কারণ বুঝতে পারলাম না।'

কুয়াশা বলল, 'চল্লিশ ফুট উঁচু পাঁচিল?'

রাজকুমারী বলল, 'বেশি হবে, কম তো নয়ই। পাঁচিল ঘেঁসে গোটা এলাকাটা ঘুরেছি। গেটটা পাহাড়ের অপর দিকে। একটা রাস্তাও নেমে গেছে। আরও অবাক কাণ্ড, গেটটা পাঁচিলের চেয়েও উঁচু এবং মনে হয় দশ টনের কম ওজন হবে না। স্টিলের মোটা পাত দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। বাইরে থেকে খোলার কোন উপায় নেই।'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'পাঁচিলের ওপারে কি আছে তা বোধহয় দেখার চেষ্টা করোনি?'

ডি. কস্টা বলল, 'নো। হাপনার জন্য ওয়েট করাই হইবে বুডিমানের কাজ ভাবিয়া···। ওই যে, ওই যে ডেকা যায় পাহাড়টা—!'

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে পাহাড়টা আর সবগুলোর চেয়ে বড়। পাহাড়ের গায়ে এবং মাথায় ঝোপ-ঝাড়। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছ। পাহাড়টার উপর যে চল্লিশ ফুটে উঁচু পাঁচিল আছে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

ঢালু গা বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে ওরা। কুয়াশার দু'পাশে ডি. কস্টা আর রাজকুমারী।

পাহাড়ের উপর উঠল ওরা। পাঁচিলটা দেখতে পেল কুয়াশা। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সে। কংক্রিটের পাঁচিল। পাঁচিলের উপর কাঁটাতারের বেড়া—সেটাও হাত তিনেক উঁচু হবে।

খুবই রহস্যময় বলে মনে হলো ব্যাপারটা। জায়গাটাকে এমন দুর্ভেদ্য দুর্গের মত করে ঘিরে রাখার কারণ কি?'

'গেটটা কোন্ দিকে? গেট কি একটাই?'

রাজকুমারী বলল, 'একটাই। সেটা ঠিক উল্টো দিকে। গেটের কাছে গিয়ে লাভ নেই। ভিতরে ঢুকতে হলে পাঁচিল টপকাতে হবে। এখান থেকেই তা করা যেতে পারে।'

'চুপ।'

কান পাতল কুয়াশা। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার শ্রবণ শক্তি অনেক প্রখর।

মিনিট খানেক চুপচাপ কান পেতে রইল কুয়াশা। তারপর বলল, 'ভিতরে কি যে আছে ঠিক বলতে পারছি না। তবে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছি আমি। অস্বাভাবিক দীর্ঘ নিঃশ্বাস। কোন মানুষ অত বড় নিঃশ্বাস ফেলে না।'

'মানুষের নিঃশ্বাস নয়। তাহলে কিসের?'

উত্তর না দিয়ে আলখেল্লার পকেট থেকে আঙুলের মত সরু নাইলনের কর্ড বের করল কুয়াশা। কর্ডের একপ্রান্তে একটা হুক। সেটা পাঁচিলের মাথার দিকে ছুঁড়ে দিল সে।

কাঁটা তারে গিয়ে আটকে গেল হুকটা। সরু কর্ড ধরে উপরে উঠতে শুরু করল কুয়াশা।

পাঁচিলের মাথার কাছে কুয়াশার মাথা পৌঁছুল। মাথা তুলল না সে আর। পাঁচিলের ওপারে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছে কিনা কে জানে। উঁকি দিল কুয়াশা।

পাঁচিলের ওপারের দৃশ্যটা এমনই অস্বাভাবিক যে স্বয়ং কুয়াশারই বেশ কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে।

পাঁচিলের ঠিক নিচেই অস্বাভাবিক মোটা স্টীলের জাল। গোটা জায়গাটাকে তিন ইঞ্চি মোটা জাল দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। দেখেই বোঝা যায় ইলেকট্রিফায়েড। জায়গাটার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি লম্বা লম্বি ভাবে ঝুলছে মোটা কেবল, তার উপর আড়াআড়ি ভাবে দুই হাত পর পর একই ধরনের, তিন ইঞ্চি মোটা স্টীলের পাত ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। চারকোনা ফাঁক বিশিষ্ট জালটা গোটা এলাকাটার উপর ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।

জালের নিচে, অনেকটা নিচে, একটা মস্ত বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়িটা দোতলা। ছাদটা প্রায় জালের কাছাকাছি পৌঁছেছে। বাড়িটা দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভাগের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা আপাদমস্তক ঢাকা সুড়ঙ্গ বা প্যাসেজ দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির একটা অংশে কামরার সংখ্যা কম করেও গোটা বিশেক তো হবেই। দ্বিতীয় অংশটা অদ্ভুত ধরনের। প্রকাণ্ড একটা কংক্রিটের বাক্সের মত দেখতে। না আছে জানালা, না আছে ভেন্টিলেটার। দরজা থাকলেও থাকতে পারে—কিন্তু তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

নিচের দিকে তাকিয়ে কুয়াশা দেখল চারদিকে উঁচু-নিচু, ছোট-বড় নানা সাইজের ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। বাড়িটার যত্ন নেওয়া হয়নি অনেকদিন, বোঝা যায়।

বাড়িটার প্রথম অংশের নিচ তলাটা শক্ত পাথর দিয়ে তৈরি। উপরের অংশটা মজবুত কাঠের। কিন্তু বাক্সের মত দেখতে দ্বিতীয় অংশটা সম্পূর্ণ পাথরের।

কুয়াশা আলখেল্লার পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করল। যন্ত্রটা সাঁড়াশির মত দেখতে। সেটা কাঁটাতারের গায়ে ঠেকাতেই নিচে কাঁচের বালবটা জ্বলে উঠল।

কাঁটাতারের বেড়ায় বিদ্যুৎ রয়েছে। স্পর্শ করা মাত্র নির্ঘাৎ মৃত্যু। যন্ত্রটা দিয়ে কাঁটাতার কাটতে শুরু করল কুয়াশা।

বেশ খানিকটা কাটা হলো। পাঁচিলের উপর উঠে এক পাশে সরে দাঁড়াল কুয়াশা। নাইলনের কর্ড বেয়ে উঠে এল রাজকুমারী। তারপর ডি. কস্টা।

'মাই গড!'

রাজকুমারী বলল, 'কল্পনা করা যায় না, তাই না কুয়াশা? এত মোটা স্টীলের জাল—কারণ কি?'

ডি. কস্টা বলল, 'হামার সওেহ, এই স্থানে যাহারা ঠাকে টাহারা ক্রিমিন্যাল। ইনোসেন্ট মানুষডেরকে ধরিয়া বণ্ডি করিয়া রাখে। বণ্ডিরা যাহাটে ভাগিটে না পারে টাহার জন্য ইলেকট্রিফায়েড এটো মোটা স্টীলের নেট ডিয়া ঘিরিয়া রাখিয়াছে।'

কুয়াশা বলল, 'না। তারগুলো তত ঘন সন্নিবেশিত নয়, দেখতে পাচ্ছেন না? চারকোনা ফাঁকগুলোর আকার দেখতে পাচ্ছেন? অনায়াসে একজন মানুষ গলে আসতে পারে।'

'তাহলে···।'

রাজকুমারীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে কুয়াশা বলল, 'আমার মনে হয় মানুষ নয়, মানুষের চেয়ে অনেক বড় কোন প্রাণীকে বাধা দেবার জন্য এই তারের ব্যবস্থা।'

'মানুষের চেয়ে অনেক বড়! কি সেই প্রাণী?'

রাজকুমারীর প্রশ্নের উত্তর দিল না কুয়াশা। প্রসঙ্গ বদলে সে বলল, 'মি. ডি. কস্টা, লাফ দিয়ে চারকোনা ফাঁক দিয়ে গলে বিল্ডিংটার ছাদে নামতে পারবেন?'

'নো···আই মীন···নো, বস্—হামি পারিবে না।'

রাজকুমারী জানতে চাইল, 'ইলেকট্রিফায়েড কিনা পরীক্ষা করে দেখলে হয় না?'

কুয়াশা বলল, 'পরীক্ষা না করেও অনুমানে বোঝা যাচ্ছে হাই-ভোল্টেজ ইলেকট্রিক কারেন্ট চলাচল করছে তারগুলোয়।'

পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের লম্বা পেন্সিল বৈর করল কুয়াশা। পেন্সিলের মাথাটা গোলাকার। সেটা ধরে টানতে শুরু করল সে। পেন্সিলের ভিতর থেকে সড় সড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল সরু ইস্পাতের তার।

সেই তার নামিয়ে দেয়া হলো নিচে। জালের গায়ে ইস্পাতের তার স্পর্শ করা মাত্র অত্যুজ্জ্বল নীল অগ্নিশিখা দেখা গেল।

কুয়াশা তুলে নিল ইস্পাতের তার। বলল, 'মৃত্যু-জাল।'

ডি. কস্টা জানতে চাইল, 'কি করিটে চান, বস্? বিল্ডিংয়ের ছাডে নামিবেন?'

রাজকুমারী বলে উঠল, 'বোকার মত প্রশ্ন করবেন না। একজন খুনী এই বিল্ডিংয়ের ভিতর লুকিয়ে আছে। তাকে ফলো করে এসেছি আমরা। নিশ্চয়ই ইলেকট্রিফায়েড তারের জাল দেখে ভয়ে পালিয়ে যাবার জন্য আসিনি। লোকটাকে চাই আমরা।'

কুয়াশা বলল, 'মি. ডি. কস্টা, আপনার স্পুটনিককে আপনি ভাল করে ধরুন বুকের সঙ্গে। আপনার কোমর ধরে আমি আপনাকে শূন্যে তুলে ধরব, সিধে করে রাখবেন দেহটা, আমি ছুঁড়ে দেব আপনাকে। ভয় নেই, হিসেব করে এমন ভাবে ছুঁড়ব আমি আপনাকে যে চারকোনা ফাঁক দিয়ে চলে যাবেন, তারে লাগবে না শরীর।'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেল ডি. কস্টার মুখের চেহারা। কি যেন বলতে চাইল সে,

কিন্তু কুয়াশা তাকে সে সুযোগ দিল না। ডি. কস্টার কোমর দুই হাত দিয়ে ধরে শূন্যে তুলল, লক্ষ্য স্থির করল গভীর মনোযোগের সঙ্গে, তারপর সজোরে ছুঁড়ে দিল জালের চারকোনা একটা ফাঁকের দিকে।

গাছের একটা লম্বা কাণ্ডের মত চারকোনা ফাঁক দিয়ে চলে গেল ডি. কস্টা। জালের মোটা তার তাকে স্পর্শ করল না। অব্যর্থ লক্ষ্য কুয়াশার। ডি. কস্টা খাড়াভাবে গিয়ে নামল ছাদের উপর। দেখা গেল বত্রিশটা দাঁত বের করে হাসছে সে।

'ফর গডস সেক! হামি বাঁচিয়া আছি!'

একই পদ্ধতিতে রাজকুমারীকে ছুঁড়ে দিল কুয়াশা। কোন দুর্ঘটনা ঘটল না। সবশেষে বাদুড়ের মত শূন্যে উড়ল কুয়াশা। পাখি যেমন উড়তে উড়তে তার ডানা শরীরের সঙ্গে সাঁটিয়ে নেয়, তেমনি ভাবে দেহের দু'পাশে হাত দুটো লম্বা করে সাঁটিয়ে নিল সে, ফাঁক গলে নিখুঁত ভঙ্গিতে নেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র, তারপরই দেখা গেল সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডি. কস্টা ও রাজকুমারীর মাঝখানে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে এদিক-ওদিক তাকাল ওরা।

'ছাদ থেকে নামতে হবে,' বলল রাজকুমারী।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল ডি. কস্টা। একই সঙ্গে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে হাতটা বের করে আনল। দেখা গেল তার হাতে একটা কালো চকচকে রিভলভার।

'মাই গড! বস্, রাইফেল!'

কিন্তু কোথায় কুয়াশা!

ডি. কস্টা বিল্ডিংয়ের সর্ব দক্ষিণের একটি কামরার জানালার দিকে রিভলভার তুলল।

গুলি করার আগেই গর্জে উঠল বিকট শব্দে একটা রাইফেল।

কুয়াশা ওদের অজ্ঞাতেই ছাদ থেকে নেমে পড়েছিল ইতিমধ্যে। বুক সমান উঁচু ঝোপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিচ্ছিল সে। ডি. কস্টার চেয়েও আগে সে দক্ষিণ দিকের জানালার সামনে দাঁড়ানো রাইলেফধারী লোকটাকে দেখেছে। লোকটা তাকে লক্ষ্য করেই রাইফেল তাক করছে তা বুঝতে পেরেই বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়ে সরে গেছে সে। বুলেটটা ছুটে গেল, কুয়াশা যেখানে এক সেকেণ্ড আগে দাঁড়িয়েছিল ঠিক সেই জায়গা দিয়ে। এক সেকেণ্ড দেরি হলেই মহা সর্বনাশ ঘটে যেত। বুলেট সরাসরি প্রবেশ করত কুয়াশার মাথায়। একটা পাঁচিলের আড়ালে চলে গেল কুয়াশা।

রাইফেলের শব্দ বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই গর্জে উঠল ডি. কস্টার রিভলভার। পরপর দু'বার গুলি করল সে। কিন্তু জানালার সামনে থেকে সরে গেছে লোকটা। রাইফেলের ব্যারেলটাও আর দেখা যাচ্ছে না।

রাজকুমারী বলে উঠল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মরতে হবে। মি. ডি. কস্টা, লাফ দিয়ে নামতে হবে···।'

'ওরে বাপরে! ইমপসিবল!'

ক্রমশ ঢালু হয়ে গেছে ছাদটা। কিনারায় দাঁড়িয়ে আঁতকে উঠল ডি. কস্টা।

রাজকুমারী চটে উঠল। বলল, 'ন্যাকামি করছেন কেন? এর চেয়ে উঁচু জায়গা থেকে লাফ দিয়েছেন আপনি বহুবার···।'

'মাফ চাই,রাজকুমারী! প্লীজ। হামি পারিব না···।'

রাজকুমারী কথা না বলে ডি. কস্টাকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে সহ লাফ দিল নিচের দিকে।

দু'জনই সশব্দে ঝোপের উপর নামল। এক গাল হেসে ডি. কস্টা বলল, 'হাপনার কোলে চড়িয়া নামিলাম—এইটুকুই আনন্দ।'

স্পুটনিক হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'ঘেউ!'

রাজকুমারী হেসে উঠল। বলল, 'মি. ডি. কস্টা, স্পুটনিক কি বলতে চাইছে বুঝতে পারছেন?'

'কি?'

'ও বলতে চাইছে আপনি একটা কাপুরুষ, ভীতুর ডিম!'

গম্ভীর হয়ে উঠল ডি. কস্টা।

কুয়াশা বলল, 'ভিতরে ঢুকতে হবে, ওমেনা। অন্য কোন জানালা থেকে গুলি করতে পারে লোকটা আবার।'

'চিনতে পেরেছ লোকটাকে?'

কুয়াশা বলল, 'পেরেছি। এই লোকই ইউনুস আদাংকে খুন করে এসেছে।'

নিকটবর্তী একটা জানালার কবাট খোলা দেখে সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। লোহার শিকগুলো কলের পাইপের মত মোটা। দুই হাত দিয়ে ধরে টান মারতে লাগল কুয়াশা সেগুলো। তিনটে লোহার শিক টেনে খুলে ফেলল ফ্রেম থেকে। একটা মানুষ যাবার মত ফাঁক হলো। জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। তার পিছু পিছু ভিতরে ঢুকল রাজকুমারী এবং ডি. কস্টা।

কামরাটা বিরাট। চামড়া দিয়ে মোড়া বেশ কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। আলমারি এবং সোফাগুলো দেখে মনে হয় বহুকালের পুরানো। ফার্নিচার এবং মেঝেতে ধুলোর পাতলা স্তর চোখে পড়ে। যেন অনেকদিন থেকে এই কামরা ব্যবহার করা হয় না।

একটা দরজা খুলল কুয়াশা। চওড়া একটা করিডরে বেরিয়ে এল সে নিঃশব্দ পায়ে। বিনাবাক্যব্যয়ে অনুসরণ করছে তাকে তার সহকারী এবং সহকারিণী।

কেউ কোথাও নেই। কোন শব্দও ঢুকছে না কানে।

যে কামরা থেকে রাইফেলের গুলি ছোঁড়া হয়েছিল সেই কামরায় প্রবেশ করল কুয়াশা। বারুদের গন্ধ এখনও ভাসছে কামরার বাতাসে। কিন্তু রাইফেল বা রাইফেলধারী নেই এখানে। উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কার্ট্রিজের একটা শেল পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

সিঁড়ির দিক থেকে মৃদু খসখসে একটা শব্দ ভেসে এল। কুয়াশা দীর্ঘ পদক্ষেপে কামরা থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল।

কাঠের সিঁড়ি, কিন্তু লাল কার্পেটে মোড়া ধাপগুলো। পা ফেললেই ধুলো উড়ছে।

উপরে উঠে একটা করিডর দেখল ওরা। দু'পাশে অনেক দরজা। প্যাসেজও

চলে গেছে দু'দিকে অনেকগুলো।

তিনজন হাঁটছে করিডর ধরে। একটার পর একটা দরজা পেরিয়ে যাচ্ছে ওরা।

ওদের ঠিক পিছনের বন্ধ দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে। প্রথমে বেরিয়ে এল একটা রিভলভারের নল। তারপর রিভলভারধারী যুবতী মেয়েটিও দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুকুম করল মেয়েটি, 'সাবধান! মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াও সবাই।'

ছয়

মেয়েটির কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি এখনও বাতাসে ভাসছে, কুয়াশা তার বিশাল দেহটাকে ঘূর্ণিঝড়ের মত তীব্র বেগে নিক্ষেপ করল পিছন দিকে। কোথা থেকে কি হয়ে গেল টেরই পেল না মেয়েটি, কুয়াশার দেহটা তার শরীরের একপাশে ধাক্কা মারল। ছিটকে তিন হাত দূরে গিয়ে পড়ল সে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে করিডরের মেঝেতে উঠে বসল, দেখল তার হাত থেকে খসে পড়া রিভলভারটা তুলে নিয়ে ঋজু ভঙ্গিতে পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে কালো আলখেল্লা পরিহিত একজন পুরুষ।

কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

রাজকুমারী এবং ডি. কস্টা মেয়েটির দু'পাশে এসে দাঁড়াল। মেয়েটির পোশাক দেখে অবাকই হয়েছে ওরা দু'জন।

নীল প্যান্ট এবং লাল শার্ট পরে আছে মেয়েটি। মাথায় ইস্পাতের তারের তৈরি নেট। পায়ে হাঁটু অবধি লম্বা জুতো। কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ।

'আমার নাম লাকী তরফদার।'

লাকীর চোখে মুখে ভয়ের ছাপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কুয়াশা দ্বিতীয় প্রশ্ন করার আগেই আবার সে মুখ খুলল, 'আপনারা কে?'

কুয়াশা তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ করছিল মেয়েটিকে। ভয়ে কাঁপছে মেয়েটি। ঢোক গিলছে ঘন ঘন।

'আমি কুয়াশা। এরা আমার বন্ধু-বান্ধব। তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় দাও।'

মেয়েটি বলল, 'কুয়াশা! আ-আপনি কুয়াশা! হায় খোদা···। কী আশ্চর্য! আপনাকে দেখার সুযোগ পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি···! আ-আমি চাকরি করতাম। বুনো সিংহ, বাঘ, ভাল্লুক, বনমানুষ—এই সব প্রাণীকে পোষ মানাবার জন্য ট্রেনিং কোর্স শেষ করেছি আমি। বর্তমানে বেকার—মিরাকল সার্কাস পার্টি ভেঙে যাবার পর থেকেই চাকরির সন্ধানে ঘুরছি। এখানে এসেছি চাকরির আশাতেই···।'

'মিরাকল সার্কাস পার্টিতে চাকরি করতে তুমি?'

মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু পার্টিটা টাকার অভাবে ভেঙে যায়···।'

'টেকনাফে এই পার্টি খেলা দেখিয়েছিল কিনা জানো?'

'জানি না মানে! ওখানে খেলা দেখাতে দেখাতেই তো পার্টির লাল বাতি

জ্বলে। সেই থেকে বেকার আমি···।'

বাধা দিয়ে কুয়াশা জানতে চাইল, 'টেকনাফের একজন লোক—তার নাম ইউনুস আদাং, চেন লোকটাকে? কিংবা এমাম রাউ নামে কাউকে?'

'না তো।'

ডি. কস্টা স্পুটনিককে বুকের কাছ থেকে নামিয়ে দিল মেঝেতে। বলল, 'বাবা স্পুটনিক, যাও টো, ঘুরে ডেকে আসো টো খুনী ব্যাটা কোঠায় কি করিটেছে! ব্যাটার ছায়া ডেকিটে পাইলেই ঘেউ ঘেউ করিয়া সিগন্যাল ডিও।'

স্পুটনিক ডি. কস্টার কথা বোঝে বলে মনে হলো। ছুটল সে চার পায়ে। দেখতে দেখতে একটা প্যাসেজে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

মেয়েটি যে কামরা থেকে বেরিয়েছিল সেটার ভিতর প্রবেশ করল কুয়াশা। এটা একটা শয়নকক্ষ। খাটের উপর না আছে তোষক না আছে চাদর-বালিশ। সবখানে ধুলো-ময়লা দেখা যাচ্ছে। পর্দাহীন একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা।

দূরে দেখা গেল বিল্ডিংয়ের গেটটা। সেদিকে নজর রেখে কুয়াশা বলল, 'তুমি এখানে কিভাবে এলে?'

লাকী বলল, 'একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দৈনিক পত্রিকায় দেখে দরখাস্ত করেছিলাম। সেই দরখাস্তের উত্তরে এই জায়গায় আসতে বলা হয়েছিল আমাকে টেলিগ্রাম করে। দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল চাকরি প্রার্থীকে বনমানুষের দুর্বোধ্য ভাষা বোঝবার এবং উচ্চারণ করবার যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'তুমি বনমানুষের ভাষা বোঝো?'

'অল্প স্বল্প বুঝি। মিরাকল সার্কাস পার্টিতে তিনটে বনমানুষ ছিল। ওদের ভাষা আমি বুঝতাম।'

'কোত্থেকে আসছ তুমি?'

লাকী বলল, 'সার্কাসের চাকরি চলে যাবার পর আমি টেকনাফেই একটা হোটেলে ছিলাম। আজই আমি রাঙ্গামাটিতে পৌঁছেছি। চট্টগ্রাম শহরে একটা কাজ ছিল, সেখান থেকে বাসে এসেছি এখানে।'

'টেলিগ্রাম করে এখানে ডেকে পাঠানো হয়েছে তোমাকে। দেখি সেটা।'

ব্যাগ থেকে টেলিগ্রামের কাগজটা বের করে দিল লাকী। কুয়াশা সেটা পড়ল। টেলিগ্রামটা নিম্নরূপ:

মিস লাকী তরফদার,

কেয়ার অব গাইড হোটেল।

চাকরি হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন।

রাঙ্গামাটির তালি পাহাড়ের উপর আমার অফিস।

সৈয়দ ইমদাদুল কবীর।

টেলিগ্রামটা ফেরত দিয়ে কুয়াশা জানতে চাইল, 'এই জায়গাটা তাহলে সৈয়দ ইমদাদুল কবীরের?'

'ট্যাক্সি ড্রাইভার তো তাই বলেছে আমাকে।'

'বস্, নামটা কিন্টু পরিচিত মনে হইতেছে।'

কুয়াশা বলল, 'স্বাভাবিক। ভদ্রলোক সমুদ্রগামী একটা শিপিং কোম্পানীর মালিক। বিরাট ধনী। বহুলোক তাকে চেনে।'

লাকী বলল, 'এখানে আসার পর কয়েকজন লোক কথা বলেছে আমার সঙ্গে। ইমদাদুল কবীর সাহেব কোথায়, কখন আসবেন—আমার এসব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাড়ির এদিক-ওদিক হঠাৎ ছুটোছুটি শুরু করে দেয় ওরা। আমি একা বসে থাকি, তারপর···।'

কুয়াশা বাধা দিয়ে জানতে চাইল, 'তোমাদের সার্কাস পার্টিতে তিনটে বনমানুষ ছিল, বলেছ। সেগুলো এখন কোথায়?'

'বলতে ভুলে গেছি—বনমানুষ তিনটে সার্কাস বন্ধ হয়ে যাবার পর হঠাৎ একদিন গায়েব হয়ে যায়। মানে, হারিয়ে যায়। শুনেছিলাম টেকনাফ শহরের এখানে সেখানে তাদেরকে দু'একদিন দেখা গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কোন সন্ধান মেলেনি।'

'কত দিন আগের কথা?'

'তা···বেশ কিছুদিন তো হবেই।'

কুয়াশা জানালা পথে আঙুল দিয়ে বিল্ডিংটার মাথার উপরকার মোটা তারের জাল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এসব কি? জানো কিছু?'

লাকী বলল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। জায়গাটা কেমন যেন—এখানে ঢোকার পর থেকেই ভয়ে আধমরা হয়ে আছি!'

'ফর গডস সেক! হামার স্পুটনিকের বিপড হইয়াছে!' প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ডি. কস্টা।

'থামো!' ধমকে উঠল রাজকুমারী। কুয়াশার উদ্দেশে ঘাড় ফেরাল সে। কিন্তু—আশ্চর্য! কামরার ভিতর কোথাও নেই সে। সকলের অজ্ঞাতে বেরিয়ে গেছে কখন।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে কুয়াশা নিচ তলায়। লাইব্রেরীর মত একটা কামরায় ঢুকে টেবিলের উপরকার কাগজপত্র পরীক্ষা করছে সে। মেঝেতেও পড়ে রয়েছে চিঠিপত্র, এনভেলাপ, ছেঁড়া টেলিগ্রাম ইত্যাদি।

বিভিন্ন জায়গা থেকে চিঠি, টেলিগ্রাম এসেছে। সবই সৈয়দ ইমদাদুল কবীরের নামে। বেশির ভাগ চিঠিপত্রই 'ফ্রেণ্ডস্ শিপিং কোম্পানী' সংক্রান্ত।

একটা ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা গেল। সৈয়দ ইমদাদুল সাহেব কোম্পানীর অফিসে সশরীরে দীর্ঘ দিন উপস্থিত হননি। ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব তিনি চিঠিপত্রের মাধ্যমে পালন করেছেন। কারণ অবশ্য জানা গেল না।

লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে একের পর এক কামরায় ঢুকে কামরাগুলো পরীক্ষা করতে লাগল কুয়াশা। কিচেন এবং প্যান্ট্রিতে ঢুকে অবাক হলো সে। খাদ্য দ্রব্যের পরিমাণ অস্বাভাবিক বেশি। চাল, ডাল, শুঁটকি মাছ—বস্তা বস্তা রয়েছে। দুটো প্রকাণ্ড আকারের চুলো দেখা গেল। হাঁড়ি পাতিল নেই, বদলে বড় বড় ডেক রয়েছে।

কিচেনের মেঝেতে লম্বা হয়ে শুয়ে কান ঠেকাল কুয়াশা কাঠের মেঝেতে।

ভুরু কুঁচকে উঠল তার। অস্বাভাবিক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ পেল সে। কোন মানুষ এমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে না।

এই রহস্যময় বাড়িটার কোথাও না কোথাও মৃত্যু ওত পেতে আছে। সেই ভয়ঙ্কর বিপদকে দেখা না গেলেও, অনুভব করতে পারছে কুয়াশা।

স্পুটনিকের ঘেউ ঘেউ শব্দও পেল কুয়াশা। শব্দটা আসছে যেন নিচের দিক থেকে।

একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। জানালা পথে দেখা যাচ্ছে বিল্ডিংটার প্রকাণ্ড গেট। গেটের গায়ে বড় বড় যন্ত্রপাতি ফিট করা। স্বয়ংক্রিয় গেট, মেশিনের সাহায্য খোলা বা বন্ধ করা হয়।

গেটের কাছ থেকে গাড়ির চাকার দাগ সোজা চলে গেছে বিল্ডিংটার দ্বিতীয় অংশে—যে অংশটা পাথরের প্রকাণ্ড বাক্সের মত দেখতে।

দরজা দিয়ে যেতে ঘুরতে হবে অনেক, কুয়াশা তাই জানালার শিক তুলে ফেলল ফ্রেম থেকে। মাথা বের করে বাইরেটা দেখে নিল সে ভাল করে। তারপর দেহটা গলিয়ে মাটিতে নামল।

প্রকাণ্ড পাথরের বাক্সটার চারদিকে চক্কর মারল সে। দরজা মাত্র একটা। আকারে প্রকাণ্ড। কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরে পরীক্ষা করল কয়েকবার। ভাঙা তো দূরের কথা, দরজাটাকে নড়ানোই গেল না। দরজার গায়ে কান ঠেকিয়ে শব্দ পাওয়া যায় কিনা পরীক্ষা করল সে।

কোন শব্দ নেই। তবে দূর থেকে যেন ভেসে আসছে সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতনের শব্দ।

ফিরে এল কুয়াশা। জানালা গলে কিচেনে ঢুকল আবার। সেখান থেকে একের পর এক বাকি কামরাগুলোয় ঢুকে পরীক্ষা করতে লাগল। স্পুটনিকের কাতর কণ্ঠের চিৎকার এখনও শোনা যাচ্ছে। একনাগাড়ে চিৎকার করে চলেছে সে। বহু নিচে থেকে উঠে আসছে শব্দটা।

বিল্ডিংয়ের নিচে পাতালপুরী আছে, কুয়াশা বুঝতে পারল। পাতালপুরীতে নামার জন্য নিশ্চয়ই গোপন পথ আছে, সেই পথের সন্ধানে এ কামরা থেকে সে কামরায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

এদিকে, দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখানে ডি. কস্টা এবং রাজকুমারী তর্ক জুড়ে দিয়েছে।

ওদের কথাবার্তা শুনে কুয়াশা বুঝতে পারল লাকীকে দোতলায় রেখে নেমে আসছে ওরা। ভারি গলায় ওদের উদ্দেশে কুয়াশা বলে উঠল, 'নিচে নেমো না, ওমেনা। তোমরা লাকীর সঙ্গে থাকো।'

দু'জনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সিঁড়িতে। উপর থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আশ্চর্য সব শব্দ। পরস্পরের দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল ডি. কস্টা ও রাজকুমারী। দোতলার কোথাও কে বা কারা যেন কাঠের পাটাতনে চাপ দিয়ে মড় মড় করে ভেঙে ফেলছে।

ছুটল ওরা সিঁড়ির মাথার দিকে। পরমুহূর্তে থমকে দাঁড়াল আবার। বিকট শব্দে ভাঙতে শুরু করেছে কাঠের খুঁটি, পাটাতন, ফ্রেম।

'ভূমিকম্প বলেও তো মনে হচ্ছে না!'

আবার ছুটল ওরা। করিডরে উঠল দু'জন। দেখল ওদের কাছ থেকে দশ পনেরো হাত সামনে, করিডরে কাঠের মেঝে উঁচু হয়ে আছে এক জায়গায়। ক্রমশ উঁচু হচ্ছে মেঝেটা। সেই সঙ্গে ফেটে যাচ্ছে চার ইঞ্চি মোটা তক্তা, ভেঙে যাচ্ছে। প্রচণ্ড একটা দানবীয় শক্তি যেন নিচ থেকে ধাক্কা মারছে মেঝের গায়ে।

লাকী ছুটে বেরিয়ে এল একটা কামরা থেকে। দুই চোখে আতঙ্ক তার। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে। মেঝেটা উঁচু হয়ে উঠতে উঠতে মড় মড় শব্দে ভেঙে যাচ্ছে। ছিটকে পড়ছে বড় বড় পেরেক, ভাঙা কাঠের টুকরো। মেঝেটা দু'ফাঁক হয়ে গেল।

পলকের জন্য একটা হাত দেখতে পেল রাজকুমারী। হাতটা ডি. কস্টার চোখেও পড়ল। নিচের দিক থেকে হাতটা দোতলার মেঝের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলছে কাঠের পাটাতন!

দানব!

স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে ওরা। হাতটা নেমে গেছে, অদৃশ্য হয়ে গেছে নিচের দিকে। সেটা যেমন অবিশ্বাস্য রকম আকারে বড় তেমনি বড় বড় ঘন কালো লোমে ঢাকা। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে বলে আলোর অভাব, ভাল দেখতে পাচ্ছে না ওরা। কিন্তু যে হাতটা ওরা দেখেছে সেটা কোন মানুষের যে নয় তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। হাতটা খুব কম করে হলেও রাজকুমারীর গোটা দেহটার মত প্রকাণ্ড তো হবেই, আরও বড় হওয়া বিচিত্র নয়।

লাকীকে দেখা যাচ্ছে না এখন। মেঝের পাটাতন উঁচু হয়ে গেছে, মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে বিরাট একটা গহ্বর। গহ্বরের ওপারে আটকা পড়ে গেছে লাকী। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে এক নাগাড়ে চিৎকার করছে সে।

লাকীর কান ফাটানো চিৎকার ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ফোঁ-ও-ও-ও-স্, ফোঁ-ও-ও-ও-স্—অস্বাভাবিক দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ। নিঃশ্বাস তো নয়, যেন ঝড় বয়ে যাবার শব্দ ভেসে আসছে নিচের দিক থেকে।

নিঃশব্দে উঠে এসেছে কুয়াশা ওদের পিছনে।

'পিছিয়ে এসো, ওমেনা!'

সবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওরা। ডি. কস্টা কাঁপা গলায় বলল, 'বস্! কি ওটা? হাটটা হাপনার বডির চেয়েও বিগ সাইজের! আই হ্যাভ সীন উইথ মাই ওউন আইজ!'

কুয়াশা নিজেও বিস্মিত কম হয়নি। নিচু গলায় বলল সে, 'এই বিল্ডিংয়ের একধারে পাথরের বিরাট একটা বাক্সের মত চারকোনা কামরা আছে। সেখান থেকে সুড়ঙ্গ পথে নিচতলায় চলে এসেছে প্রাণীটা। সবকিছু ভেঙেচুরে মুক্ত করতে চাইছে সম্ভবত নিজেকে···। সরো তোমরা, লাকীকে বাঁচাবার চেষ্টা করা দরকার।'

দুই হাত মুখের কাছে চোঙের মত করে ধরে বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল কুয়াশা। কিছু যেন নির্দেশ দিল সে লাকীকে। কিন্তু কি যে বলল তা ঠিক বুঝতে পারল না ডি.কস্টা বা রাজকুমারী।

যাদুমন্ত্রের মত কাজ হলো।

একটা টর্চ বের করে জ্বালল কুয়াশা। বিরাট গহ্বরটার ভিতর আলো ফেলল

সে।

থেমে গেছে লাকীর চিৎকার। থেমে গেছে প্রকাণ্ড দানবটার লম্ফঝম্ফ। কিছুই দেখা গেল না গহ্বরের ভিতর।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল ওরা। কোথাও কোন শব্দ নেই।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল ওরা কান পেতে। ভীতিকর একটা পরিবেশ বাড়িটার সর্বত্র। বিপদ কোত্থেকে কখন ঘাড়ে এসে পড়বে আগে থেকে বোঝার উপায় নেই।

'হামার স্পুটনিক কাঁডিটেছে!'

খোলা জানালা পথে বাইরে তাকাল কুয়াশা। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তার। ছুটে গেল জানালার একেবারে সামনে।

দূরে দেখা যাচ্ছে প্রায় দশটন ওজনের সুউচ্চ গেটটা। কেউ নেই সেখানে। কিন্তু গেটটা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে।

কুয়াশার দুই পাশে ডি. কস্টা এবং রাজকুমারী দাঁড়াল।

'অটোমেটিক গেট। বিদ্যুৎচালিত।'

রাজকুমারী ফিসফিস করে বলল।

কুয়াশা বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় অংশের দিকে আঙুল তুলে বলে উঠল, 'দেখো!'

বাক্সের মত প্রকাণ্ড পাথরের কামরার বিশাল দরজাটা খুলে গেছে কখন যেন। ওরা সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে পঁচিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু প্রায় সেইরকমই লম্বা একটা ভ্যান। এইরকম প্রকাণ্ড আকারের ভ্যান সচরাচর দেখা যায় না। ভ্যানের গায়ের রঙ নীল। দেখে বোঝা যায় ইস্পাতের মোটা পাত দিয়ে তৈরি বডিটা।

গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল ভ্যানটা, থামল। পায়ে হেঁটে এরপর পাথরের কামরা থেকে বেরুল একজন পিস্তলধারী লোক। লোকটা পিছু হেঁটে বেরুল। এরপর পিছু হেঁটে বেরুল লাকী। দূর থেকেও বোঝা গেল কাঁপছে সে আতঙ্কে। তারপরই বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখল ওরা। পাথরের কামরার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আট মানুষ সমান উঁচু প্রকাণ্ড একটা দানব।

রুদ্ধশ্বাসে সম্মোহিতের মত চেয়ে রইল ওরা। দানবটা এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। ভ্যানের ভিতর উঠল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল আড়ালে।

ভ্যানের ড্রাইভিং সীটে পাশাপাশি কয়েকজন লোক বসে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল ওরা। এই লোকটাই ইউনুস আদাংকে খুন করেছে। এই লোকটাই খানিক আগে রাইফেল দিয়ে গুলি করেছিল কুয়াশাকে। লোকটার মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কপালে লম্বা একটা ক্ষতচিহ্ন।

এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে পেল ডি. কস্টা। তার হাতের কালো চকচকে রিভলভারটা গর্জে উঠল পর পর দু'বার।

'লাভ নেই। বুলেট-প্রুফ কাঁচ।'

উইণ্ডস্ক্রীনে গিয়ে লাগল বুলেট দুটো, কিন্তু কাঁচ ভেদ করে শত্রুদের গায়ে লাগল না। বন্ধ হয়ে গেছে ভ্যানের পিছনের গেট। লাকীকে তুলে নেয়া হয়েছে সামনের সীটে। ছুটতে শুরু করেছে ভ্যান। গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মস্ত গাড়িটা।

ছোঁ মেরে ডি. কস্টার হাত থেকে কেড়ে নিল কুয়াশা রিভলভারটা। আলখেল্লার পকেট থেকে দুটো কাঁচের বুলেট বের করে রিভলবারে ভরল সে।

ভ্যানটা গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। গর্জে উঠল কুয়াশার হাতের রিভলভার।

ভ্যানটার কোন ক্ষতিই হলো না। কাঁচের বুলেটটা ভ্যানের গায়ে লেগে শত-সহস্র টুকরো হয়ে ভেঙে গেল শুধু।

গেট অতিক্রম করে বেরিয়ে গেল ভ্যানটা সবেগে! হারিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

এরপর অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটল। শব্দ এবং ধাক্কা—দুটোই একসঙ্গে আক্রমণ করল ওদেরকে। বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কানের পর্দা ফেটে যাবার উপক্রম হলো। তিনজন ছিটকে পড়ে গেল কামরার মেঝেতে।

ঘনঘন কাঁপছে কামরার দেয়াল, ছাদ, মেঝে। চারদিকে ধুলো উড়ছে। সন্ধ্যার ম্লানিমাকে তাড়িয়ে দিল আগুনের শিখা।

তিনজন উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল আবার জানালার দিকে। বাইরে তাকাতেই ওরা ধোঁয়া আর আগুন দেখতে পেল। পাথরের তৈরি বাক্সের মত চারকোনা কামরাটাকে দেখা যাচ্ছে না। সেখানে নৃত্য করছে আগুন। কালো ধোঁয়ায় চারদিক ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দ্রুত।

জানালা পথে বাইরে বেরিয়ে ছুটল ওরা।

বিশাল অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে ঘুরে বেড়াল ওরা কিছুক্ষণ। আগুনের ভিতর কেউ যদি থেকেও থাকে, তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। আগুনের চারদিকে কাঁচের টুকরো, ভাঙা কাঁচের জার, অসংখ্য টেস্ট-টিউব এবং বোতল দেখতে পেল ওরা। বাক্সের মত জায়গাটার ভিতর ল্যাবরেটরি ছিল, অনুমান করা যায়।

বিল্ডিংয়ের প্রথম অংশে ফিরে এল ওরা। স্পুটনিকের কাতর ক্রন্দন ধ্বনি অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কিন্তু কান পাতলে শোনা যাচ্ছে এখনও।

কুয়াশার সঙ্গে ওরাও যোগ দিল পাতালপুরীতে নামার গোপন পথ খুঁজে বের করতে। খানিক পরই আবিষ্কৃত হলো পথটা। কিচেনের মিটসেফটা সরাতেই দেখা গেল একটা সিঁড়ি পথ নেমে গেছে নিচের দিকে।

নিচে নামতে শুরু করল ওরা। প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র এবং টর্চ। যতই নামছে ওরা, একটা যান্ত্রিক শব্দ উচ্চকিত হয়ে উঠছে। পোড়া গন্ধ এবং ধোঁয়ায় শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে উঠল। বোঝা গেল পাথরের যে কামরাটাকে বোমা ফাটিয়ে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে সেটা থেকে একটা সুড়ঙ্গ পথ বিল্ডিংয়ের প্রথম অংশে এসে মিলিত হয়েছে। ধোঁয়া আসছে এদিকে সেই পথেই। কুয়াশা একসময় বলে উঠল, 'শব্দটা কিসের বুঝতে পারছ, ওমেনা?'

প্যাসেজ ধরে এগোচ্ছে ওরা। রাজকুমারী বলল, 'ইলেকট্রিক জেনারেটর।'

প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা দরজা। দরজাটা সাধারণ যে কোন দরজার চেয়ে আকারে দশ-বারোগুণ বড়। দরজার গায়ে কাঁচের একটা জানালা।

সেই জানালার সামনে দাঁড়াতেই ওরা স্পুটনিককে দেখতে পেল। বিশাল কামরার এক কোণায় বসে ঘেউ ঘেউ করছে সে।

কামরার ভিতর আরও লক্ষণীয় জিনিস দেখা যাচ্ছে। যান্ত্রিক শব্দটাও আসছে

কামরার ভিতর থেকে। জেনারেটরটা কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। জেনারেটরের সামনে, খালি মেঝেতে, হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে মোটাসোটা একজন মানুষ। একটু একটু নড়ছে যেন সে। কিন্তু মাথা তোলার চেষ্টা করলেও, পারছে না। লোকটা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে, দেখেই বোঝা যায়।

দরজাটা মজবুত। ভাঙা সম্ভব নয়। আলখেল্লার পকেট থেকে ক্ষুদ্রাকার একটা শিশি বের করল কুয়াশা। সাদা তরল পদার্থ শিশি থেকে ঢেলে দিল সে তালার উপর।

বড় আকারের ইস্পাতের তালাটা গলে গেল।

দরজার কবাট খুলতেই স্পুটনিক তিন লাফে ছুটে এল ডি. কস্টার কাছে।

সাদরে বুকে তুলে নিল ডি. কস্টা স্পুটনিককে।

কুয়াশা ইতিমধ্যে মোটাসোটা মানুষটাকে দুই হাত দিয়ে তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। বলল, 'এখানে থাকা নিরাপদ নয়। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।'

রাজকুমারীকে চিন্তিত দেখাল। বলল, 'আমি ভাবছি স্পুটনিক এখানে ঢুকল কিভাবে?'

কুয়াশা উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল প্যাসেজে। সিঁড়ির দিকে এগোল সে। তার কাঁধের লোকটা নিঃসাড় হয়ে গেছে, সম্ভবত জ্ঞান নেই তার। ডি.কস্টা ও রাজকুমারী অনুসরণ করল কুয়াশাকে।

উপরে উঠে ওরা দেখল বিল্ডিংয়ের প্রথম অংশটাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে আগুন। ধোঁয়ায় চারদিক ঢাকা পড়ে যাচ্ছে দ্রুত। ছুটল ওরা।

গেটটা খোলাই ছিল। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল ওরা পাহাড়ী রাস্তায়।

রাজকুমারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কী সাঙ্ঘাতিক! প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারব বলে আশা করিনি। বাড়ি তো নয়, যেন প্রকাণ্ড একটা খাঁচা!'

ডি. কস্টা বলল, 'প্রোপ্রাইটার—সৈয়দ ইমদাদুল কবীর, লোকটা ক্রিমিন্যাল না হইয়া পারে না। ব্যাটাকে একবার হাটে পাইলে হয়, টারে আমি মজা ড্যাখাব।'

কুয়াশার কাঁধের উপর নিঃসাড় পড়ে থাকা লোকটা হঠাৎ নড়েচড়ে উঠল। দুর্বল কণ্ঠে সে বলল, 'আ-আমিই সৈয়দ ইমদাদুল কবীর···!'

সাত

চারদিকে অন্ধকার নেমেছে। সুউচ্চ পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রহস্যময় বিল্ডিংটা জ্বলছে দাউ দাউ করে। আগুনের আভায় চারদিক লালচে দেখাচ্ছে। গেটের সামনের সমতল রাস্তার উপর সৈয়দ ইমদাদুল কবীরকে শুইয়ে দিল কুয়াশা। কাউকে কিছু না বলে দ্রুত, নিঃশব্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সে। অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

মিনিট বিশেক পর ফিরল কুয়াশা।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবার আগে কুয়াশাই প্রশ্ন করল, 'কবীর সাহেব কথা বলেছেন?'

সৈয়দ কবীর উঠে বসেছে রাস্তার উপর। কুয়াশার দিকে তাকাল সে। বলল,

'শয়তানের দল আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল ইঞ্জেকশন দিয়ে।'

কুয়াশা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছিল সৈয়দ কবীরকে। লোকটার পোশাক শত ছিন্ন, ময়লা। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চক্ষু কোটরাগত।

বলতে শুরু করল সে, 'আপনাদেরকে শয়তানরা পাঁচিলের উপর দেখেই আমাকে ইঞ্জেকশন দেয়। উপরতলায় ছিলাম তখন আমি। আমাকে বাধ্য করছিল ওরা তখন রোজকার মত কাগজপত্রে সই করতে। ঘুমিয়ে পড়ার পর কি ঘটেছে তা আর মনে নেই।'

কুয়াশা প্রশ্ন করল, 'এ বাড়িটা কার?'

'আমার। কিন্তু এটার চেহারা এরকম ছিল না। পাঁচিল, তারের জাল, পাথরের কামরা, সব ওরা তৈরি করেছে। ওদের হাতে গত এক বছরেরও বেশি হলো আমি বন্দি হয়ে আছি। আমাকে ওরা ভয় দেখিয়ে, শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে চেক-বইয়ে সই করায়, চিঠিপত্র লেখায়। ওদের অবাধ্য হলে মেরে ফেলবে এই ভয়ে হুকুম মত সব করে গেছি আমি। মি. কুয়াশা, আপনাকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছেন আমাকে বাঁচাবার জন্যে! দয়া করে আপনি আমাকে নিরাপদ কোথাও নিয়ে চলুন···।'

'আপনাকে বন্দি করে রেখেছে কে?'

সৈয়দ কবীর বলল, 'সানাউল হক।'

'সানাউল হক? কে সে?'

'লোকটা আমাদের শিপিং কোম্পানীতে চাকরি করত। একজন কেমিস্ট। টেকনাফে ছোট একটা ওয়ার্কশপ আছে আমাদের। সেখানকার ওয়ার্কশপে কাজ করত সে। অযোগ্য এবং অনুপযুক্ত বলে আমরা তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলাম···।'

কুয়াশা বলল, 'আপনাকে বন্দি করে রেখেছিল কেন?'

সৈয়দ কবীর বলল, 'নিজের অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। যদিও তার উদ্দেশ্য যে কি তা আজও আমি জানতে পারিনি। এই বাড়িটা সে দখল করে। নিজে সে কিছুই করেনি। সব করিয়েছে আমাকে দিয়ে। আমাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলিয়ে বাড়িটাকে নিজের ইচ্ছে মত দুর্গ করে তুলেছে সে।'

'অস্বাভাবিক বড় আকৃতির কোন প্রাণী দেখেছেন আপনি বাড়িতে?'

'বড় আকৃতির প্রাণী?'

ডি. কস্টা বলল, 'হ্যাঁ—ডৈট্য-টৈট্য? মনস্টার?'

'দৈত্য! মনস্টার!'

'হ্যাঁ—ডেকেছেন?'

'হায় খোদা! তার মানে···আপনারাও বুঝতে পেরেছেন···মানে,—না, দেখিনি। কারণ শয়তানরা আমাকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডের একটা সেলে বন্দি করে রেখেছিল। একটা মাত্র দরজা ছিল, কোন জানালা ছিল না। তবে পায়ের আওয়াজ পেতাম আমি। থপ্‌থপ্ করে হাঁটাহাঁটি করত, বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ পেতাম। ভেবেছিলাম হাতি জাতীয় কোন প্রাণী···।'

কুয়াশা জানতে চাইল, 'দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা সংক্রান্ত কোন

ব্যাপারে ওদেরকে আলোচনা করতে শুনেছেন কখনও।'

'হ্যাঁ, শুনেছি। পত্রিকা অফিসে বিজ্ঞাপন পাঠাত ওরা—তবে এখান থেকে নয়। বিজ্ঞাপনগুলোর বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে শুনিনি আমি।'

'সানাউল হক দেখতে কেমন? ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, কপালে লম্বা ক্ষতচিহ্ন···!'

'না। ওই লোকটা সানাউল হকের ডান হাত। ওর নাম জগদীশ। সানাউল হক লম্বা, একহারা চেহারার লোক। নাকটা খাড়া, ফর্সা রঙ।'

আগুন সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে বাড়িটাকে। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারদিক।

নেমে এল ওরা ঢালু রাস্তা বেয়ে।

কুয়াশা বলল, 'কবীর সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব এখন থেকে আমাদের উপর। সানাউল হক বা আর কেউ, সে যত বড় শক্তিশালীই হোক, আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

সৈয়দ কবীর শুষ্ক গলায় বলল, 'আমি বড় ভীতু লোক, মি. কুয়াশা। আপনি আমাকে নতুন জীবন দান করেছেন। আপনার ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারব না।'

হাঁটতে হাঁটতে কুয়াশার মার্সিডিসের কাছে পৌঁছুল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল কুয়াশা। তার পাশে রাজকুমারী। ব্যাক সীটে স্পুটনিককে নিয়ে ডি. কস্টা এবং সৈয়দ কবীর উঠল।

গাড়িতে স্টার্ট দিল না কুয়াশা। রেডিও-টেলিফোনের সুইচ অন করল সে। লাউডস্পীকারের মাধ্যমে ভেসে এল একটা যান্ত্রিক শব্দ। হেলিকপ্টার যে রকম শব্দ করে, অনেকটা সেই রকম।

কুয়াশা কথা বলল মুখের সামনে মাউথপীস ধরে, 'হ্যালো, তোমাদের খবর কি?'

লাউডস্পীকারে ভেসে এল রাসেলের গলা, 'ভাইয়া, আপনার নীল রঙের ভ্যানের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না কোথাও! নীল রঙের একটা ভ্যান দেখেছিলাম বটে কিন্তু সেটা তেমন বড় নয়। ভ্যানটার গায়ে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু ফ্লুরোস্কোপিক চশমা পরেও কেমিক্যাল দেখলাম না। জ্বলজ্বল করে জ্বলবার কথা কেমিক্যাল, তাই না?'

ইউনুস আদাঙের খুনী জগদীশ যখন ভ্যান নিয়ে গেট পেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, বিল্ডিংয়ের বাইরে তখন কুয়াশা ডি. কস্টার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে বিশেষ একধরনের কাচের বুলেট নিক্ষেপ করেছিল। বুলেটগুলোর ভিতর একধরনের কেমিক্যাল ছিল। খালি চোখে তা দেখা যায় না। ফ্লুরোস্কোপিক চশমা পরে টর্চের সাহায্যে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি নিক্ষেপ করলে সেই কেমিক্যাল দেখতে পাবার কথা।

গেটের বাইরে সৈয়দ কবীরকে শুইয়ে রেখে বিশ মিনিটের জন্য অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল কুয়াশা। সেই সময়টা গাড়ির কাছে ফিরে এসে রেডিও-টেলিফোনের সাহায্যে শহীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। শহীদকে সব কথা ব্যাখ্যা করে জানিয়ে সে অনুরোধ করে তার আস্তানা থেকে দুটো হেলিকপ্টার নিয়ে দুইজন মিলে যেন নীল রঙের ভ্যানটাকে খুঁজে বের করে। শহীদ এবং রাসেল দুটো কপ্টার নিয়ে আকাশে ওড়ে।

'শহীদ কোন্‌দিকে গেছে?'

'পশ্চিম দিকে।'

কুয়াশা বিনকিউলার লাগাল চোখে। তাকাল পুবাকাশের দিকে। আকাশের গায়ে ছোট্ট একটা বিন্দু দেখল সে। বলল, 'রাসেল, তোমার মিনি 'কপ্টারকে আরও ওপরে ওঠাও।'

রাসেল জানতে চাইল, 'বিল্ডিংটার অবস্থা কি? ছাই হয়ে গেছে?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। তবে আমরা সৈয়দ কবীর সাহেবকে উদ্ধার করেছি।'

সৈয়দ কবীর সম্পর্কে সংক্ষেপে বলল কুয়াশা রাসেলকে।

ডি. কস্টা বলল, 'টেকনাফে যে পুওর ম্যানটি মারা গিয়াছে—টর্নাডো নহে, টাহার বাড়ি ভাঙ্গিয়া ডিয়াছে মনস্টার হিমসেলফ! দ্যাট ভেরি ডৈট্যই খুন করিয়াছে ডুর্ভাগা এমাম রাউকে!'

সৈয়দ কবীর হঠাৎ বলে উঠল, 'বন্দি দশার কথা মনে পড়লেই ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায় আমার। জানেন, মি. কুয়াশা, শয়তানরা যে আমাকে কাগজপত্রে সই করতে বাধ্য করত শুধু তাই নয়, কাগজপত্রগুলো আমাকে পড়তেও দিত না তারা।'

কুয়াশা বলল, 'সানাউল হক টেকনাফের ওয়ার্কশপে কাজ করত। সেই ওয়ার্কশপটা টেকনাফের কোন্‌দিকে?'

সৈয়দ কবীর জানাল, 'ওয়ার্কশপটা এখন আর নেই। স্থানান্তরিত করা হয়েছে চট্টগ্রামে।'

পুবাকাশ থেকে রাসেলের মিনি 'কপ্টার অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রেডিও-টেলিফোনে এমন সময় ভেসে এল শহীদের ভারি কণ্ঠস্বর, 'কুয়াশা, ভ্যানটাকে দেখতে পেয়েছি।'

'কোথায়?'

'বান্দরবনের দিকে যাচ্ছে। কাপ্তাই এবং বান্দরবনের মধ্যবর্তী বনভূমির ভিতর দিয়ে ছুটছে। রাস্তাটা একেবারে বাজে। এই রাস্তা কেন বেছে নিয়েছে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

কুয়াশা বলল, 'যোগাযোগ রাখো সর্বক্ষণ। চোখের আড়াল কোরো না। আমরা এগোচ্ছি।'

মার্সিডিসে স্টার্ট দিল কুয়াশা।

পরমুহূর্তে শহীদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কুয়াশা—।'

মাঝপথে থেমে গেল শহীদের কণ্ঠস্বর। শোনা গেল ঠা-ঠা-ঠা-ঠা, ঠা-ঠা-ঠা-ঠা—মেশিনগানের অনর্গল গুলিবর্ষণের আওয়াজ।

'শহীদ! শহীদ!'

কুয়াশা মাউথপীসের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বারবার ডাকতে লাগল। কিন্তু শহীদ সাড়া দিল না। রেডিও-টেলিফোনের মাধ্যমে ভেসে আসছে শুধু মেশিনগানের ঠা-ঠা-ঠা-ঠা, ঠা-ঠা-ঠা-ঠা শব্দ, অবিরাম। তারপর, প্রচণ্ড একটা সংঘর্ষের শব্দ হলো। তারপর—সব স্তব্ধ। রেডিও-টেলিফোনের মাধ্যমে এতটুকু শব্দ আসছে না আর।

মার্সিডিসের গতি বাড়তে লাগল। স্পীডমিটারের কাঁটা কাঁপতে কাঁপতে 100

লেখা জায়গাটায় পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। মার্সিডিস যেন উড়তে শুরু করেছে রাস্তার উপর দিয়ে।

আট

ফ্লুরোস্‌কোপিক চশমা তো চোখে ছিলই, শহীদ নাইট বিনকিউলারও ব্যবহার করছিল। তবু ভাগ্যগুণেই দেখতে পেয়েছে ভ্যানটাকে ও।

রাস্তাটা প্রশস্ত হলেও দু'পাশে ঘন বনভূমি। গাছপালার প্রসারিত শাখা-প্রশাখা এবং পাতায় ঢাকা পড়ে আছে রাস্তাটা। উপর থেকে রাস্তাটার অস্তিত্ব টের পাওয়া মুশকিল।

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির বদৌলতে জ্বলজ্বলে কেমিক্যাল চোখে পড়েছিল শহীদের। সঙ্গে সঙ্গেই মিনি 'কপ্টার নিচে, অনেক নিচে নামিয়ে আনে সে। বিশেষ ধরনের ইঞ্জিন ফিট করা আছে, শব্দ হয় না। শহীদ ভ্যানটার প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপরে নামিয়ে আনল 'কপ্টারকে। তারপর রেডিও-টেলিফোনের মাধ্যমে সুখবরটা জানাল কুয়াশাকে।

কুয়াশাকে খবরটা দেবার কয়েক মুহূর্ত পরই শহীদ বিপদ টের পেল। ভ্যানের জানালা দিয়ে দুটো মেশিনগানের ব্যারেল বেরিয়ে আসতে দেখল ও।

বিপদ টের পেয়েই শহীদ নিজের কোলের উপর রাখা স্টেনগানটা তুলে নিয়ে গুলি করতে শুরু করে। শত্রুরাও প্রায় একই সময়ে মেশিনগান চালাতে আরম্ভ করে।

প্রথম ঝাঁকের প্রায় সব ক'টা বুলেট 'কপ্টারের গায়ে, এঞ্জিনে বিদ্ধ হয়। 'কপ্টারের কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে শহীদ। স্টেনগান ফেলে দিয়ে 'কপ্টারকে সামলাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে ও। কিন্তু শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে 'কপ্টারের এঞ্জিনে আগুন ধরে গেছে।

নিচের দিকে তাকিয়ে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করে ফেলল শহীদ। 'কপ্টারের মায়া ত্যাগ করতে হবে। প্রাণ বাঁচানোই এখন প্রধান কর্তব্য। আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে 'কপ্টারের গায়ে, যা করার দেরি না করে করতে হবে।

সবেগে তির্যক ভাবে নিচের দিকে নামছে 'কপ্টার। সামনে একটা উঁচু পাহাড়। সংঘর্ষ অবধারিত। কন্ট্রোল প্যানেলের একটা লাল বোতামে চাপ দিল ও। পরবর্তী সেকেণ্ডে দেখা গেল সীট সহ শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে শহীদ।

শূন্যে খুলে গেল প্যারাসুট। কয়েকমুহূর্ত পর জঙ্গলের মধ্যে নামল শহীদ। দ্রুত প্যারাসুট মুক্ত হয়ে ঝোপের ভিতর নিঃশব্দে পড়ে রইল ও। 'কপ্টারটা পঁচিশ গজ দূরে গিয়ে পড়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে সেটা। আগুন ছড়িয়ে পড়ছে আশেপাশের ঝোপঝাড়ে।

ভ্যানের আরোহীরা আশেপাশেই আছে। নিশ্চয়ই তারা 'কপ্টারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসবে। 'কপ্টারে শহীদ বা শহীদের লাশ নেই দেখলেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তারা ওর সন্ধানে···।

শহীদ দ্রুত ভাবছিল—কি করা উচিত এখন। কুয়াশা নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কিন্তু তার পৌঁছুতে সময় লাগবে। এদিকে ওর কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই···।

শহীদ সিদ্ধান্ত নিল। 'কপ্টারের কাছ থেকে সরে যাবে ও যতদূর সম্ভব। ঝোপের ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলো ও।

এগিয়ে চলল পুব দিকে ক্রল করে।

'থামো! থামো! পালিয়ে যাবে কোথায় বাছাধন!'

ডান দিক থেকে ভেসে এল কর্কশ কণ্ঠস্বর। পরমুহূর্তে ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পাঁচজন কুৎসিত দর্শন লোক। তাদের হাতে রিভলভার, দু'জনের হাতে স্টেনগান। পাঁচজনের দলটা ঘিরে ধরল শহীদকে।

ধীরে ধীরে মাথার উপর হাত তুলল শহীদ।

প্রশ্ন করল জগদীশ, 'কে তুমি?'

উত্তর দিল না শহীদ। জগদীশ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পর প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল শহীদের চোয়ালে। চিৎকার করে উঠল, 'কথা বল! কে তুই? নাম কি তোর?'

মুখ দিয়ে নয়, শহীদ উত্তর দিল ওর হাত এবং পা দিয়ে। চোখের পলকে বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। জগদীশের পেটে সবুট লাথি মারল, দুই পাশের দুই শয়তানের নাকে দুই হাত দিয়ে দুটো ঘুসি চালাল একই সঙ্গে।

পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই ধরাশায়ী হলো। কিন্তু এক সেকেণ্ড পরই ওর পিছন থেকে গর্জে উঠল একজন শত্রু, 'নড়েছ কি মরেছ!'

শহীদ অনুভব করল, ওর মাথার পিছনে কঠিন ধাতব পদার্থের স্পর্শ। রিভলভারের নল।

জগদীশ উঠে দাঁড়াল। শহীদের পিছন থেকে রিভলভারধারী হিংস্র কণ্ঠে অনুমতি চাইল, 'দেব শেষ করে, জগদীশ বাবু?'

দাঁতে দাঁত চেপে জগদীশ বলল, 'না। শালাকে তো মারতেই হবে, একটু পর। আতঙ্কে দগ্ধে মরুক শালা, তাই আমি চাই!'

নাইলনের কর্ড দিয়ে হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ভ্যানে তোলা হলো ওকে। ভ্যানের পিছনে ছোট্ট একটা কামরা, সেই কামরার মেঝেতে পড়ে রয়েছে একটি মেয়ে—লাকী। লাকীর মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। তাকে নামানো হলো নিচে। সেই জায়গায় তোলা হলো শহীদকে। পা দুটোও বেঁধে ফেলা হলো ওর। বন্ধ করে দেয়া হলো বাইরে থেকে ইস্পাতের দরজা।

ভ্যান ছুটতে শুরু করল আবার।

মেঠো পথ ধরে ঘণ্টাখানেক এগোল ভ্যান। ঝাঁকুনি কমল এরপর। শহীদ অনুমান করল, পাকা রাস্তায় উঠে এসেছে ভ্যান।

দু'বার মাত্র বাঁক নিয়ে ঘণ্টাখানেক ঝড়ের বেগে ছুটল গাড়িটা। তারপর থামল।

ড্রাইভিং সীট থেকে নামল সবাই, শব্দ শুনে বুঝতে পারল শহীদ।

জগদীশ বলছে, 'নকীব, তুই চিনবি তো জায়গাটা?'

নকীব বলল, 'চিনব না মানে! এই এলাকায় জন্ম আমার···।'

জগদীশ বলল, 'মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। নকীব, তুই আর ফিচেল—দু'জনে পারবি না কাজটা সারতে?'

'পারব। কিন্তু ভ্যানটা সহ দানবটাকে বোমা ফাটিয়ে ধ্বংস করা—এটা ঠিক ভাল মনে হচ্ছে না আমার···।'

জগদীশ নিচু গলায় বলল, 'বড় বেশি কথা বলিস তুই, নকীব। বসের নির্দেশ যা, তাই তো করব আমরা? এই দানবটা বসের কথা ঠিক মত পালন করছে না, গোলমাল করছে—তাই একে শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। চট্টগ্রামে হামলা করার সময় আমরা সবগুলো দানবকে একত্রিত করব···যাক সে কথা। পরিকল্পনা বদলাতেও হতে পারে। ভাল কথা, বন্দি কুত্তাটাকে দানবটার সঙ্গেই···বুঝলি তো?'

নকীব বলল, 'বুঝেছি। ওদেরকে খতম করে যাব কোথায় আমরা?'

'কতবার বলব? আগেই তো বলেছি, টেকনাফে যেতে হবে। দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা যাই। ঠিক মত করা হয় যেন কাজটা। কোথাও কোন ভুল হলে আস্ত রাখব না কাউকে।'

ভ্যান আবার ছুটতে শুরু করল। মিনিট পাঁচেক পর আবার ঘনঘন হেলতে দুলতে শুরু করল সেটা। শহীদ বুঝতে পারল, মেঠো পথে নেমেছে আবার গাড়িটা।

আরও পনেরো মিনিট কাটল। হঠাৎ ভ্যানের ইঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেল। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল শহীদ। একমুহূর্ত পরই রহস্যটা বুঝতে পারল ও।

ভ্যান প্রশস্ত একটা সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে পড়েছে। গতি কমে গেছে অনেক।

এই প্রথম ভ্যানের ভিতর থেকে শব্দ আসছে, টের পেল শহীদ। ভ্যানের প্রকাণ্ড খাঁচায় প্রকাণ্ডদেহী কোন প্রাণী আছে অনুমান করল ও। সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে। নড়ে চড়ে উঠছে।

হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলো ভ্যানটা। তীব্র ঝাঁকুনি লাগল। মাথাটা ঠুকে গেল শহীদের ইস্পাতের দেয়ালের সঙ্গে। চোখমুখ বিকৃত হয়ে উঠল ব্যথায়।

ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে ভ্যানের।

নকীব এবং ফিচেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে সে। পদশব্দ এগিয়ে আসছে। ছোট্ট কামরাটার কাছে এসে থামল পদশব্দ, শহীদের উদ্দেশে লোকটা কথা বলে উঠল, 'ওহে হিরো, কেমন বোধ করছ?'

ফিস ফিস করে আবার বলল লোকটা, 'বারুদ লাগানো সলতেতে আগুন দিয়ে পালাচ্ছি আমরা ট্যানেল থেকে। বোমা ফাটবে। তার মানে, আজ তোমার মরণ—। হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ!'

নকীব চলে গেল। কান পেতে রইল শহীদ। কোথাও কোন শব্দ নেই। ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর এই নিস্তব্ধতা। ভ্যানের প্রকাণ্ড খাঁচার রহস্যময় প্রাণীটাও কোন শব্দ করছে না।

খস্!

দেশলাই জ্বালল কেউ, অস্পষ্ট শব্দটা কানে ঢুকল শহীদের। একমুহূর্ত

কাটল। তারপর দু'জন লোকের ছুটন্ত পদশব্দ কানে ঢুকল। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে পায়ের।

বিপদের গুরুত্ব অনেক আগেই বুঝতে পেরেছে শহীদ। মৃত্যু দ্রুত এগিয়ে আসছে।

মাথা খারাপ করে লাভ নেই। অপেক্ষা করতে হবে এখন ওকে। রিস্টওয়াচের দম দেয়ার জন্যে ক্ষুদ্র চাকাটার পাশে আরও একটি চাকা আছে, সেটা ইস্পাতের মেঝের সঙ্গে চেপে ধরে অন করে দিয়েছে ও। ঘূর্ণায়মান একটা গোল ধারালো ব্লেড বেরিয়ে এসেছে ঘড়ির ভিতর থেকে। নাইলনের কর্ড ধীরে ধীরে কাটছে।

গভীর অন্ধকার। শত্রুরা যখন ভ্যানের পিছনের ছোট্ট এই জায়গাটায় ওকে তোলে, ক্ষুদ্র একটা ভেন্টিলেটার দেখেছিল শহীদ। বাঁধনমুক্ত হলে, ভেন্টিলেটারে চোখ রেখে প্রাণীটাকে দেখার চেষ্টা করবে ও। জানার চেষ্টা করবে বোমা ফাটাবার জন্যে বারুদের সলতেতে সত্যি আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে কিনা।

বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ঘামছে শহীদ। হাতের বাঁধন মুক্ত হলো কয়েক মুহূর্ত পর। পায়ের বাঁধন খুলতে আরও অল্প সময় লাগল।

পায়ের জুতো জোড়া খুলল ও। একটি জুতোর গোপন কুঠরি থেকে বের করল পেন্সিল টর্চ।

ছোট্ট জায়গাটা টর্চের আলোয় দেখল শহীদ ভাল করে। ইস্পাতের দেয়াল, দরজাটাও তাই। মানুষ তো দূরের কথা, দানবের পক্ষেও ভাঙা সম্ভব নয়।

ভেন্টিলেটারটা অনেক উঁচুতে। দুই দিকের দেয়ালে দুই পা দিয়ে একটু একটু করে উঠতে শুরু করল শহীদ।

পাশাপাশি ছোট ছোট তিনটে ফুটো, ভেন্টিলেটার বলতে ওইগুলোই। একটা ফুটোয় চোখ রাখল শহীদ।

কোন প্রাণী বা কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু লাল একটা আগুনের উজ্জ্বল টুকরো দেখা গেল। আগুনটা ক্রমশ এগোচ্ছে।

সলতে! বারুদের সলতে! সত্যিই তাহলে বোমা ফাটবে!

পেন্সিল টর্চটা অপর একটি ফুটোর মুখে ঠেকিয়ে বোতামে চাপ দিল শহীদ।

আলোকিত হয়ে উঠল ভিতরটা।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল শহীদ। রুদ্ধশ্বাসে দেখল প্রকাণ্ড, লোমশ প্রাণীটাকে। বনমানুষ ওটা? কিন্তু অমন প্রকাণ্ড দেহ কিভাবে সম্ভব? কম করেও একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে সাত-আটগুণ বেশি লম্বা প্রাণীটা, সেই অনুপাতে চওড়াও।

পরমুহূর্তে মৃত্যু চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠল শহীদ। উপর থেকে ঝুপ্ করে নামল সে মেঝেতে। দ্বিতীয় জুতোটার গোপন কুঠরি থেকে বের করল অতি ক্ষুদ্র একটি ওয়্যারলেস।

পার্টসগুলো জোড়া লাগাতে ত্রিশ সেকেণ্ড সময় লাগল। ঘামে ভিজে যাচ্ছে হাতের তালু। দ্রুত কাজ করার চেষ্টা করলে কি হবে, হাত দুটো কাঁপছে বলে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সেট অন করে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল শহীদ।

'আই অ্যাম ইন ডেঞ্জার। শহীদ খান স্পিকিং! শহীদ খান টু কুয়াশা! আই

অ্যাম ইন ডেঞ্জার!'

মিনি স্পিকার থেকে ভেসে এল কুয়াশার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর, 'তোমার লোকেশন বলো শহীদ। বিপদটা কি ধরনের?'

'লোকেশনটা ঠিক বলতে পারব না। 'কপ্টার যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেখান থেকে একটানা গাড়ি চালিয়ে এই জায়গায় আসতে লেগেছে এক ঘণ্টা বিশ মিনিট। সম্ভবত কোন পাহাড়ের মধ্যে, সুড়ঙ্গের ভিতর রয়েছে ভ্যানটা। ভ্যানের ভিতর প্রকাণ্ড একটা···দানবই বলব, রয়েছে। পাশের ছোট একটা কামরায় রয়েছি আমি। দানবটা যেখানে রয়েছে সেখানে জ্বলছে বারুদের সলতে। বোমাটা ফাটাবার ব্যবস্থা করে শত্রুরা ছুটে পালিয়ে গেছে।'

কুয়াশা কথা বলল না পাঁচ সেকেণ্ড। এই পাঁচ সেকেণ্ডকে মনে হলো পাঁচ-পাঁচটা যুগ।

'শহীদ, হিসেব করে বুঝতে পারছি, তুমি আমাদের কাছ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছ। আমরা পৌঁছুবার আগেই···। কুইক। তুমি দেখে বলো সলতে আর কতটা বাকি আছে পুড়তে?'

দুই দেয়ালের গায়ে পা দিয়ে আবার উঠতে শুরু করল শহীদ। বুকের ভিতর কেমন যেন একটা অচেনা অনুভূতি দুর্বল করে তুলছে ওকে। এই যে চেষ্টা করছে ও—সব বৃথা! মৃত্যুকে আজ আর ঠেকানো যাবে না।

'গজ দু'য়েক! মাত্র গজ দু'য়েক, কুয়াশা।'

কুয়াশা বলল, 'শহীদ, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।'

বলল বটে কুয়াশা, কিন্তু তার নিজের কণ্ঠস্বরই কেঁপে গেল। পরমুহূর্তে বলল, 'দরজা ভাঙার কোন উপায়ই নেই?'

'না! দেয়াল এবং দরজা স্টিলের।'

'দানবটাকে উত্তেজিত করা যায় না? তাকে দিয়ে ইস্পাতের দেয়াল ভাঙানো যায় না?'

শহীদ আবার উঠল দেয়ালের গায়ে পা দিয়ে ভেন্টিলেটারের কাছে। পেন্সিল টর্চ জ্বেলে দেখল, বারুদের সলতেটা পুড়ছে নির্দিষ্ট গতিতে। ক্রমশ, ছোট হয়ে আসছে সেটা।

চিৎকার করে উঠল ও, 'এই! আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করো। তুমি আর আমি···আমাদেরকে খুন করার ব্যবস্থা করেছে ওরা···।'

শব্দ পেয়ে ভেন্টিলেটারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বটে প্রকাণ্ডদেহী দানবটা, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না তার মধ্যে।

ছেলেমানুষি ব্যাপার মনে হলো শহীদের। বনমানুষের মত প্রকাণ্ড একটা দানব, সে ওর ভাষা বুঝবে এটা আশা করা বোকামি!

'কাজ হচ্ছে না কুয়াশা!'

শহীদের কণ্ঠে নৈরাশ্য। ভেঙে পড়ছে ও। বুঝতে পারছে, শেষ রক্ষা আজ আর হবে না।

কুয়াশার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'ঘণ্টায় আশি মাইল স্পীডে এগোচ্ছি আমরা গাড়ি নিয়ে, শহীদ। কিন্তু সময় মত পৌঁছুতে পারব না, তার আগেই বোমা ফাটবে।

আমি চিন্তা করে বের করার চেষ্টা করছি, কোন উপায়…।'

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে শহীদ। বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। কুয়াশার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার সময় আশা করেছিল, কোন একটা রাস্তা সে দেখিয়ে দেবে, যার ফলে অতীতের মত এবারও অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাবে ও।

সে-ভুল ভেঙে গেছে। এখনও কুয়াশা পঁয়ত্রিশ মাইল দূরে।

বোমা ফাটতে সময় নেবে বড়জোর আর দেড় মিনিট।

আর দেড় মিনিট!

মাত্র দেড় মিনিট!

দেড় মিনিট!

আর…এক মিনিট!

মাত্র এক মিনিট!

স্পিকার থেকে কুয়াশার কণ্ঠস্বর বের হচ্ছে না! ভাবছে কুয়াশা। বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে! আর সময় নেই। সময় নেই! সময় নেই!

এখনও আশা করছ তুমি, শহীদ? নিজেকে প্রশ্ন করল শহীদ। না, আশা করছি না—নিজেকে জানাল ও।

মৃত্যু!

কুয়াশা চুপ করে আছে। কি বলবে সে? এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে কোন মানুষ কোন মানুষকে রক্ষা করতে পারে না।

অবশেষে মুখ খুলল শহীদই।

'মহুয়াকে বোলো…বোলো…'

কথা শেষ করতে পারল না শহীদ, কুয়াশার যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর কানে ঢুকল।

'তোমার ওয়্যারলেস সেটের স্পিকারটি ভেন্টিলেটারের কাছে নিয়ে গিয়ে ধরে রাখো, শহীদ। কুইক! কুইক!'

'কি লাভ…।'

প্রায় ধমকে উঠল কুয়াশা, জীবনে এই প্রথম, 'যা বলছি করো—কুইক!'

আবার ভেন্টিলেটারের কাছে উঠল শহীদ। স্পিকারটা ধরল একটা ফুটোর দিকে মুখ করে। 'ধরেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে দুর্বোধ্য শব্দ বেরিয়ে এল স্পিকারের ভিতর থেকে।

কণ্ঠস্বরটা কুয়াশার, চিনতে পারছে শহীদ। কিন্তু শব্দগুলোর অর্থ এতটুকু বুঝতে পারছে না ও।

কুয়াশা কিচির মিচির করে অনর্গল শব্দ করে চলেছে। এমন সময় লাফিয়ে উঠল পাহাড় প্রমাণ দানব।

সিধে হয়ে দাঁড়াল প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু দানব। দুই বটবৃক্ষের মত মোটা হাত দিয়ে আঘাত করল সে ইস্পাতের দেয়ালে।

দুলে উঠল ভ্যান। পা পিছলে যাওয়ায়, উপর থেকে মেঝেতে পড়ে গেল শহীদ।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল ও। না, ও টলছে না। ভ্যানটা অসম্ভব দুলছে বলে

মনে হচ্ছিল সেইরকম।

কান ফাটানো বিস্ফোরণের মত আওয়াজ করছে দানবটা। সেই সঙ্গে ভ্যানের গায়ে লাথি মারছে, ঘুসি মারছে, শরীর দিয়ে ধাক্কা মারছে…।

মোটা ইস্পাতের দেয়াল, ভাঙবে কেন! উল্টে পড়ে যাবার উপক্রম হলো ভ্যানটা। প্রমাদ গুণল শহীদ। কুয়াশা কিভাবে কে জানে খেপিয়ে দিয়েছে বটে দানবকে, কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না।

এমন সময় শহীদ দেখতে পেল—দরজার ইস্পাতের কবাট ফাঁক হয়ে গেছে ইঞ্চি ছ'য়েক।

ভ্যানটা ধাক্কা খাচ্ছে সুড়ঙ্গের দুই দিকের দেয়ালের সঙ্গে। তারই ফলে দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে জায়গায় জায়গায়। দুই কবাটের মধ্যবর্তী সংযোগ ঢিলে হয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ ফাঁক হচ্ছে।

কিন্তু সময় দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। আর বোধহয় কয়েক সেকেণ্ড বাকি আছে বোমাটা ফাটতে।

অথচ মানুষ গলবার মত ফাঁক সৃষ্টি হচ্ছে না…।

'শহীদ! কাজ হচ্ছে কিছু?'

'না—আরও অন্তত কয়েক মিনিট সময় লাগবে। কিন্তু তার আগেই…।'

কথা শেষ করতে পারল না শহীদ, দেখল, কবাট দুটোর মধ্যবর্তী ফাঁকটা আচমকা বড় হয়ে গেল।

মাথা গলিয়ে দিল শহীদ। কিন্তু হা হতোস্মি। মাথা গলল বটে, কিন্তু দেহটা আটকে গেল। কোন মতে সেটা গলছে না। ভ্যানটা প্রতিমুহূর্তে ধাক্কা খাচ্ছে বলে ফাঁকটা আবার ছোট হয়ে গেছে।

প্রতি সেকেণ্ডে শহীদ আশঙ্কা করছে—এই ফাটল বুঝি বোমাটা!

দেহটা আটকা পড়ে গেছে ফাঁকের মধ্যে। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা। প্রাণপণ চেষ্টা করছে শহীদ বেরিয়ে যাবার…হঠাৎ ছিটকে পড়ে গেল ও ভ্যানের বাইরে।

ফাঁকটা বড় হয়ে যাওয়ায় ঘটনাটা ঘটল।

মাটিতে পড়েই উঠে দাঁড়াল শহীদ। মাথা নিচু করে দিক নির্ণয় না করেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটল ও। সামনে সুড়ঙ্গের বাঁক, বুঝতে না পারায় ধাক্কা খেল ভীষণভাবে। ঘুরে উঠল মাথা, পড়ে গেল ছিটকে। কিন্তু পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে বাঁক নিল, দৌড়ুতে লাগল তীর বেগে।

খানিক পর আলো দেখতে পেল ও।

সুড়ঙ্গের মুখ দেখা গেল। নিক্ষিপ্ত তীরের মত সেই মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটল বিস্ফোরণ।

সুড়ঙ্গের মুখটা যেন কামানের মুখ, ভিতর থেকে পাথরের টুকরো, ধুলোর পাহাড় বেরিয়ে এল সবেগে। আশপাশের গাছপালা, মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। পাহাড়ের উপর ফাটল সৃষ্টি হলো কয়েকটা। বিস্ফোরণের শব্দ ক্রমশ মিলিয়ে গেলেও নিক্ষিপ্ত পাথর পড়ার শব্দ আরও খানিকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল।

আচমকা, প্রায় কানের কাছে, গর্জে উঠল একটা রিভলভার। চরকির মত ঘুরে দাঁড়াতেই শহীদ দেখতে পেল কুয়াশাকে।

'কংগ্রাচুলেশনস্, শহীদ!'

শহীদ মুখোমুখি দাঁড়াল কুয়াশার, 'গুলি করলে যে?'

'শত্রুরা তোমাকে দেখছিল আড়াল থেকে। ভেগেছে। আচ্ছা, গ্যাসোলিনের গন্ধ পাচ্ছ কি? সম্ভবত শত্রুদের 'কপ্টার আছে আশপাশে। শত্রুরা ওতে চড়ে পালাবে···।'

শহীদ জানতে চাইল, 'তুমি এত তাড়াতাড়ি এলে কিভাবে?'

'রাসেল 'কপ্টারে তুলে নিয়েছিল আমাকে। নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে সৈয়দ কবীর, রাজকুমারী এবং মি. ডি. কস্টাকে নিয়ে আসতে।'

শহীদ জিজ্ঞেস করল, 'দানবটাকে তুমি কিচিরমিচির করে কি এমন বললে যে···?'

কুয়াশা হাসল। বলল; 'আমার পোষা গরিলা গোগীর সঙ্গে কথা বলতাম আমি এই ভাষায়। আকারে প্রকাণ্ড হলেও দানবটা বনমানুষ বলেই মনে হয়েছিল আমার। শেষ চেষ্টা হিসেবে আমি গোগীর ভাষায় দানবটাকে নির্দেশ দিই ভ্যানটাকে ভেঙে ফেলার জন্যে। বিপদের কথাটাও বলি। তাতেই কাজ হয়।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটের মত একটা মিনি ওয়্যারলেস বের করল কুয়াশা। সেটটা অন করে কথা বলল সে, 'রাসেল।'

রাসেলের কণ্ঠস্বর অস্পষ্টভাবে শোনা গেল, 'আমরা উপরে এসে পৌঁছেছি।'

'ফ্লাড লাইট জ্বালো। শত্রুদের একটা 'কপ্টার আছে এই এলাকায়। খুঁজে পাও কিনা দেখো চেষ্টা করে।'

কুয়াশার কথা শেষ হবার আগেই কাছাকাছি থেকে একটা ইঞ্জিনের শব্দ ভেসে এল। দৌড়ে গিয়ে লাভ নেই, আকাশে উঠতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে 'কপ্টারটা।

খানিকপর নিকষ কালো আকাশের গায়ে কপ্টারটাকে দেখতে পেল কুয়াশা। ছোট ছোট দুটো বালব জ্বলছে ককপিটে! একমুহূর্ত পর দুটো অত্যুজ্জ্বল ফ্লাড লাইটের আলো শত্রুপক্ষের 'কপ্টারে গিয়ে পড়ল।

পরিষ্কার দেখতে পেল কুয়াশা এবং শহীদ 'কপ্টারটাকে। ককপিটে জগদীশকে দেখে একটু অবাকই হলো শহীদ! জগদীশ আসলে 'কপ্টার নিয়ে এসেছে খানিক আগে তার সহকারীদের তুলে নিতে।

ওরা দেখল জগদীশের পাশে বসে রয়েছে লাকী। ঝড়ের বেগে দূরে সরে যাচ্ছে কালো রঙের 'কপ্টারটা।

কুয়াশা নির্দেশ দিল রাসেলকে, 'ফলো করবার দরকার নেই। ওরা সুযোগ পেলেই গুলি করবে। তুমি গুলি করতে পারবে না—কারণ লাকী রয়েছে ওদের সঙ্গে। নেমে এসো 'কপ্টার নিয়ে।'

খানিক পর ফাঁকা জায়গায় নামল দুটো মিনি 'কপ্টার। সৈয়দ কবীর শুকনো গলায় বলে উঠল, 'ভয়ে মরেই যাচ্ছিলাম আমি! প্লেন বা 'কপ্টারে চড়তে ভীষণ ভয় করে আমার।'

শহীদ বলল, 'শত্রুরা রওনা হয়েছে টেকনাফের দিকে। কুয়াশা আমরা নিশ্চয়ই···।'

কুয়াশা বলল, 'অবশ্যই।'

সৈয়দ কবীর আঁতকে উঠল, 'আবার! আবার আকাশে উঠতে হবে?'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা টেকনাফে যাব। শত্রুরা ওখানেই যাচ্ছে। আপনি কি চান না যারা আপনাকে বন্দি করে রেখেছিল তাদের উপযুক্ত শাস্তি হোক?'

'চাই না মানে! একশোবার চাই। কিন্তু, মি. কুয়াশা, আমি একজন ভীতু লোক! আমি এই গোলাগুলি, হাঙ্গামা-ফ্যাসাদের মধ্যে থাকলে নির্ঘাৎ মরে যাব। ওরা—মি. কুয়াশা, ওদেরকে আপনি চিনতে পারেননি! ভয়ঙ্কর হিংস্র ওরা। কথায় কথায় খুন করে। ওদের বিরুদ্ধে লাগার কোন ইচ্ছা আমার নেই। ওদের শাস্তি হোক তা চাই, কিন্তু আমি নিজে ওদের বিরুদ্ধে যেতে পারব না, সে সাহস আমার নেই। মি. কুয়াশা, আমি বরং ঢাকায় চলে যাই। যতদিন না এই সব বিপদ কাটে ততদিন ঢাকাতেই থাকব আমি।'

কুয়াশা বলল, 'আপনার যেমন ইচ্ছা। যাক—রাসেল, শোনো। তুমি রাঙ্গামাটিতে যাবে, এখনই। ওখানে গিয়ে সৈয়দ কবীর সাহেবের শিপিং কোম্পানির হেড অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবে। যাবতীয় কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ—সব পরীক্ষা করবে তুমি। সৈয়দ সাহেব জানতে চান গত এক বছরে বাধ্য হয়ে যে-সব কাগজে তিনি সই করেছেন, সেগুলো কি ধরনের কাগজ, সেগুলোয় সই করে তিনি কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।'

সৈয়দ কবীর বলল, 'শয়তান সানাউল হক সম্পর্কে কোন খবর নেবার দরকার নেই। আমি জানি সে-ই এই সব গণ্ডগোলের মূলে আছে।'

কুয়াশা রাসেলের উদ্দেশে বলতে শুরু করল, 'সানাউল হক একজন কেমিস্ট···।'

'কেমিস্ট না ছাই! নামে মাত্র কেমিস্ট। শয়তানটার মাথায় গোবর ভরা। পাগলের প্রলাপ বকত সারাক্ষণ। সবাই বলত বদ্ধ উন্মাদ লোকটা। কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করত যখন-তখন। তার ধারণা ছিল, গৃহপালিত গরু, ছাগল, ভেড়া, মুরগী—এই সব প্রাণীকে আকারে দশ গুণ বড় করা সম্ভব।'

'প্রাণীদেরকে দশগুণ বড় আকারে পরিণত করার কথা বলত সানাউল হক?'

'বলত। তার ধারণা ছিল, তা করতে পারলে গরুর দুধও হবে দশগুণ, মুরগীর ডিম হবে এখনকার চেয়ে দশগুণ বড়···। এই সব আবোলতাবোল বকত বলেই তো তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। আমরা তাকে পাগল ভাবলেও সে পাগল নয়, সে আসলে শয়তান। ক্ষমতার পূজারী। পাওয়ার চায় সে।'

নয়

রাতের বাকি অংশ এবং পরদিন বিকেল অবধি মহা ব্যস্ততার মধ্যে কাটল।

সকালে রাসেল গেল সৈয়দ কবীরকে নিয়ে ফ্রেণ্ডস শিপিং কোম্পানীর হেড অফিসে। সৈয়দ কবীরকে দেখে অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ আনন্দের ঢেউ উঠল। কিন্তু সৈয়দ কবীরকে খুব বিমর্ষ দেখাল সারাক্ষণ। বিশেষ কারও সঙ্গে বেশি কথা বলল না সে।

কাগজপত্র পরীক্ষা করতে শুরু করল রাসেল। উল্লেখযোগ্য নানা ব্যাপার

জানতে পারল সে। রহস্যময় ব্যাপার হলো, কোম্পানি গত বছরখানেক আগে ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা তুলে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য কিনেছে। সেই খাদ্যদ্রব্য বার্জ যোগে পাঠানো হয়েছে কক্সবাজারে। বার্জের গন্তব্যস্থান সম্পর্কে অবশ্য কিছুই জানা গেল না। এসব কাজ কোম্পানির ম্যানেজার সম্পন্ন করেছেন, সৈয়দ কবীরের লিখিত চিঠির নির্দেশ অনুযায়ী। সৈয়দ কবীর বললেন, 'শয়তানের দল আমাকে সই করিয়ে নিয়ে এই সব কাণ্ড করেছে, বুঝতে পারছি।'

কোম্পানির একাউন্ট থেকে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। প্রতিটি চেকে সই ছিল সৈয়দ কবীরের। চেকের টাকার প্রাপক ছিল সানাউল হক।

'শয়তানটার নামে বাধ্য হয়ে চেক কাটতে হত আমাকে। টাকার অঙ্ক সেই বসিয়ে নিত।'

সন্ধ্যার বেশ খানিক আগে চট্টগ্রাম থেকে রওনা হলো ওরা। কুয়াশার নিজস্ব 'কপ্টারে চড়ল সবাই। সৈয়দ কবীর বিদায় জানাল হাত নেড়ে।

কুয়াশাকে সৈয়দ কবীর জানিয়েছে, পরবর্তী প্লেনে সে ঢাকায় যাবে।

হেলিকপ্টারে কুয়াশা ছাড়াও রয়েছে শহীদ, রাজকুমারী, রাসেল, মি. ডি. কস্টা এবং তার বাচ্চা স্পুটনিক।

কামাল নেই শুধু। সে ঢাকাতে আছে প্রথম থেকেই। এবার শহীদ চট্টগ্রামে একাই বেড়াতে এসেছে। হেলিকপ্টারের কন্ট্রোল কেবিনে রয়েছে কুয়াশা।

সোফায় বসে ডি. কস্টা স্পুটনিককে শিক কাবাব খাওয়াচ্ছে। শহীদ এবং রাসেল গল্প করছে। রাজকুমারী ওমেনা বিজ্ঞান বিষয়ক একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে একমনে।

লাউডস্পীকারে ভেসে এল শান্ত অথচ গমগমে একটা কণ্ঠস্বর, 'টেকনাফের উপর পৌঁছে গেছি আমরা।'

টেকনাফ। পাহাড়, বনভূমি, সাগর এবং নদী—সবই আছে টেকনাফে। শহরটা অত্যন্ত ছোট। ভাল হোটেল নেই বললেই চলে। মন্দের ভাল একটাই, সেটার নাম মডার্ন হোটেল অ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট। লোকসংখ্যা খুবই কম। শহরে উপজাতীয়দের দেখা পাওয়া যায়।

শহীদ এবং রাজকুমারী কন্ট্রোল কেবিনে গিয়ে ঢুকল। পিছন পিছন গেল রাসেল এবং ডি. কস্টা।

কুয়াশা বলল, 'আমরা সাগরের কাছাকাছি ইউনুস আদাঙের বাড়ির সামনে গিয়ে নামব। রাতটা কাটাতে হবে তাঁবুতে। সকাল থেকে তদন্তের কাজ শুরু করা হবে।'

'ইউনুস আদাঙের বাড়ি চিনবেন কিভাবে আপনি?' জানতে চাইল রাসেল।

'চিনব। দৈনিক একটা পত্রিকায় ইউনুস আদাঙ এবং এমাম রাউয়ের বাড়ির লোকেশান মোটামুটি বর্ণনা করা হয়েছিল।

সাগরের উপর দিয়ে উড়ছে কুয়াশার স্পেশাল হেলিকপ্টার ধীর গতিতে। নিচে সাগর, পাশেই বালুকাবেলা, তারপরই বনভূমি।

আরও মাইলখানেক পরই একটা দো-চালা দেখা গেল বনভূমির ভিতর।

কুয়াশা বলল, 'ইউনুস আদাঙের বাড়ি।'

আরও আধমাইলটাক এগিয়ে সাগরে নামল। ভাসতে লাগল সি-প্লেনের মত। তীরের দিকে এগিয়ে চলল স্পেশাল 'কস্টার।

নোঙর ফেলে বালুকাবেলায় নামল ওরা।

কুয়াশা বলল, 'শহীদ, ইউনুস আদাঙয়ের বাড়ির কাছে নয়, আমরা তাঁবু ফেলব এমাম রাউয়ের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির কাছে। দুর্ঘটনা ঘটেছে যেখানে সেখানে রাতটা কাটাতে চাই আমি।'

কেউ আপত্তি করল না। সকলের আগে আগে চলল কুয়াশা। বিশ-পঁচিশ গজ এগোতেই ধ্বংসস্তূপ দেখা গেল। দো-চালাটা চেনবার কোন উপায়ই নেই। ভাঙা বাঁশ, ভাঙা তক্তা, কাঠের টুকরো, দোমড়ানো-মোচড়ানো ঢেউ টিন—স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে টর্চের আলোয় ধ্বংসস্তূপটা দেখতে লাগল ওরা।

সবাই যে যার কাঁধের বোঝা নামিয়ে রাখল ঘাসের উপর। জায়গাটা এমাম রাউয়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত দো-চালার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে, অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়। তাঁবু ফেলার কাজ শেষ হলো ঘন্টাখানেকের মধ্যে। বুনো জীব-জানোয়ারের আক্রমণ হতে পারে বলে তাঁবুর চারধারে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হলো। কাঠ সংগ্রহ করে সাজানোই হলো শুধু, তাতে আগুন ধরানোর কাজটা বাকি রইল। রাসেল বলল, 'আগুন না ধরালেও চলে।'

ডি. কস্টা বলল, 'আগুন জ্বালিয়েও লাভ নেই। ডেকিটেছেন না আকাশের অবস্থা কেমন ক্লামজি রূপ ধারণ করিটেছে।'

সকলে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। সাগরের গর্জন বাড়ছে যেন ক্রমশ। আকাশের দিকে তাকাল সবাই। তাইতো! বৃষ্টি আসবে মনে হচ্ছে। কালো মেঘ দ্রুত ঢেকে ফেলছে গোটা আকাশটাকে।

সুন্দর পরিবেশ। তাঁবুর ভিতর স্পঞ্জের ফাঁপা বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল সবাই।

ক্লান্ত শরীর, দু'চোখ জুড়ে ঘুম নামল সকলের।

—

mmhs013